পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণাসমূহের সারসংক্ষেপ

প্রকাশক:
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সম্পাদক:
ড. মুঃ সোহরাব আলি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চ: দা:)
পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রকাশকাল: মে ২০২৫

বাণী

পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে ই-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা, ইটিপির কার্যকারিতা, ঝাউবন অবক্ষয়, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব, ইটভাটার দূষণ, বায়ুদূষণ, শিল্প দূষণ, পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নদী দূষণ এবং ল্যান্ডফিল গ্যাসের দূষণ অন্যতম।

কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিপজ্জনক কীটনাশক ও বিষাক্ত রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গবেষণায় বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের পরিমাণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ই-বর্জ্য এবং এর ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো খতিয়ে দেখা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আইলা ও সিডরের প্রভাব মূল্যায়ন করে উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর লবণাক্ততার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঢাকা শহরের ইটভাটাগুলোর দূষণ এবং এর ফলে বায়ু ও মাটির গুণগতমানের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। শিল্প দূষণ কমাতে একটি জিআইএস (GIS) ভিত্তিক শিল্প ব্যবস্থাপনা Integrated Management Information System (IMIS) তৈরি করা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ইটিপি-এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নদীগুলোর দূষণের মাত্রা মূল্যায়ন করতে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ল্যান্ডফিল থেকে নির্গত মিথেন গ্যাসের পরিমাণ এবং তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়। পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত ঝাউ বনের অবক্ষয় এবং উপকূলে বনভূমি উজাড়ের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, রিয়েল-টাইমে বায়ুদূষণের মাত্রা পরিমাপ এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের এই উদ্যোগগুলো টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। আশা করা যায়, এই গবেষণাগুলোর ফলাফল বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থার উন্নতি এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতে পরিবেশ অধিদপ্তর এই ধরনের গবেষণামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করবে এবং দেশের পরিবেশ সুরক্ষায় আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

পরিবেশ অধিদপ্তর একটি কারিগরী প্রতিষ্ঠান যার কাজের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অতীব জরুরী। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান সৃষ্টির নিমিত্তে ২০০৯ সাল থেকে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

গবেষণাসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছে। যেমন, ২০১৪ সালে সিলেট অঞ্চলের খনিজ উত্তোলনের জন্য টেকসই গাইডলাইন প্রণয়ন এবং ২০২৩ সালে সংশোধিত পানির গুণগত মানের মানমাত্রা প্রবর্তন। এছাড়া, এসডিজি সূচক ৬.৬.১, ৯.৪.১ ও ১৪.১.১-এর ডেটা তৈরি করে বাংলাদেশ বৈশ্বিক পরিবেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে।

এ যাবতকালে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলসমূহকে কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে সংশ্লিষ্ঠ সকলের নিকট সহজলভ্য করার মানসে এ প্রকাশনা তৈরি করা হয়েছে। এটি পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে আসবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ড. মুঃ সোহরাব আলি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চ: দা:)
পরিবেশ অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যাঁর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণার কার্যক্রমের সারাংশটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা আমাদের পথ চলাকে সহজ করেছে। তাঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক **ড. মুঃ সোহরাব আলি** মহোদয়ের প্রতি, যাঁর সুপরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত এই গবেষণাসমূহের সারসংক্ষেপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন ও কর্মকর্তাগণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেছেন, তা নিঃসন্দেহে গবেষণার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত সকল গবেষণার প্রতিবেদন কিউআর কোডের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এসব গবেষণাকে একত্রিত করে অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণায় যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখার উপপরিচালক **বেগম ফারহানা মুস্তারি**, সহকারী পরিচালক **জনাব জাওয়াতা আফনান**, পরিকল্পনা শাখার উপপরিচালক **ড. সোনিয়া আফসানা**, এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তরের পরিদর্শক **জনাব মোঃ রকিবুল হাসান** যাঁদের সহযোগিতা এই গবেষণাসমূহের সারসংক্ষেপ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সবশেষে, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গবেষণার সারাংশ লেখার কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

মোঃ হান্নান
সহকারী পরিচালক
অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর
পরিবেশ অধিদপ্তর

সুচিপত্র:

নং-	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
০১	Research on Health Hazards of Food Contaminants and its Control Measures:	১-৩
০২	Survey of E-waste Status in Dhaka City: Environmental Hazard and Treatment Options:	৩-৪
০৩	Study On Impacts of Cyclone AILA and SIDR on Environment and Ecosystem in the coastal Areas of Bangladesh:	৪-৫
০৪	Environmental Impact Study of Brick Kiln in Dhaka District:	৬-৭
০৫	Environmental and Morphological Impact Assessment on the Rivers of Sylhet Region due to mechanical Extraction of Stone, Gravel and Sand:	৮-৯
০৬	Development of a GIS based Industrial Database for the Department of Environment:	১০-১১
০৭	Development of GIS based Industrial Database for the Department of Environment for Chittagong Division:	১২-১৩
০৮	Geospatial Technology based Water Quality Monitoring System for Bangladesh	১৫-১৬
০৯	Updating of Environmental Impact Assessment (EIA) Guidelines and One Guide for Assessment of Effluent Treatment Plant (ETP)	১৭-১৮
১০	Assess the Climate Change Effects on Marginal Farmers of Northern Bangladesh	১৯-২১
১১	Performance Evaluation of Zero Liquid Discharge-Effluent Treatment Plants (ZLD-ETPS) In Textile Industries of Bangladesh	২২-২৪
১২	Environment Friendly Reuse of Steel Slag as Construction Material	২৪-২৫
১৩	Assessment of Generation of E-waste, Its Impacts on Environment and Resource Recovery Potential in Bangladesh	২৬-২৭
১৪	Environmental Impact Study of Two Tannery Estates on the Buriganga and the Dhaleswari River	২৭-২৯
১৫	A Study on Preparation of River Health Cards of Some Rivers of Bangladesh	৩০-৩১
১৬	A study on Pollution Remediation of Dhaka Hazaribagh Tannery Area	৩২-৩৩
১৭	Identification of Causes for degradation of Jhau Plantation and impacts of Jhau plantation to Coastal Morphological Development the Cox's Bazar	৩৪-৩৫

১৮	A Study on Development of Model Based Guidelines for Permitting Brick Kilns	৩৬-৩৭
১৯	A study on Baseline Development of SDG Indicators: 6.6.1 and 15.1.2	৩৮-৪০
২০	A Study on Damage Assessment for Environmental Compensation.	৪০-৪২
২১	A study to Delineate of ECAs Boundary for all ECAs of Cox's Bazar District	৪২-৪৩
২২	Assessment of Methane Emission from Matuail and Amin Bazar Landfill site and Options for Mitigation	৪৫-৪৬
২৩	Water Monitoring Software Up gradation	৪৬
২৪	Air Quality monitoring system (Real Time Air Quality Monitoring System & Health Alarming System)	৪৭
২৫	Study of the SDG Indicator 12.4.2. (a): Hazardous Waste Generated Per Capita and 12.4.2(b): Proportion of Hazardous Waste Treated by Type of Treatment.	৪৯-৫০
২৬	Study of the SDG Indicator 9.4.1: CO_2 Emission Per Unit of Value Added.	৫০-৫১
২৭	Study of the SDG Indicator 14.2.1: Number of Countries using Ecosystems- based Approaches to Managing Marine Areas.	৫১-৫২
২৮	Study of the SDG Indicator 14.1.1(a): Index of Coastal Eutrophication.	৫৩-৫৪
২৯	Inclusion of all the Ecological Critical Areas (ECAs) as Protected Areas (PA) in the World Database on Protected Areas (WDPA) and Identify & Include Key Biodiversity Areas (KBAs) in the World Database of KBAs (WDKBAS)	৫৫

অর্থবছর: ২০১০-২০১১

২০১০-২০১১ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ (তিনটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এসব গবেষণা Eusuf and Associates, Environmental Conservation Management Consultants Ltd. (ECOMAC) এবং Social Upliftment Society (SUS) কর্তৃক সম্পাদিত হয় নিম্নে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Research on Health Hazards of Food Contaminants and its Control Measures	Eusuf and Associates	১১ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
খ)	Survey of E-waste Status in Dhaka City: Environmental Hazard and Treatment Options	ECOMAC (Environmental Conservation Management Consultants Ltd)	৫ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
গ)	Study On Impacts of Cyclone AILA and SIDR on Environment and Ecosystem in the Coastal Areas of Bangladesh	SUS (Social Upliftment Society)	৮ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

ক. (Research on Health Hazards of Food Contaminants and its Control Measures)

গবেষণার লক্ষ্য:

১) মাটি, কৃষিপণ্য ও মাছের মধ্যে কীটনাশক ও বিষাক্ত টেক্সটাইলের রং রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করা।

২) দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

পটভূমি:

বাংলাদেশের কৃষি ও টেক্সটাইল শিল্পে কীটনাশক ও রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে মাটি, পানি, খাদ্যপণ্য ও মানবস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে দেশে ৩,৬০৬ ধরনের কীটনাশক থাকলেও মাত্র ১৫০টি ব্যবহৃত হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকরা নির্ধারিত সময় মেনে ফসল সংগ্রহ করেন না, ফলে খাদ্যে বিষাক্ত অবশিষ্টাংশ থেকে যায়। মুন্সীগঞ্জের এলাকায় কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের রিপোর্ট বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাওয়া যায়। টেক্সটাইল শিল্পে

ব্যবহৃত সীসা, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়াম জাতীয় রাসায়নিক অপরিশোধিতভাবে নদী ও পরিবেশে মিশে যায়। কুষ্টিয়ার কুমারখালী অঞ্চলে ৮,৫১২টি হ্যান্ডলুম (ডাইং) থেকে প্রতিবছর ২৩০ মেট্রিক টন ডাইং এর বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে ফেলা হয়। ফলে কুষ্টিয়ার মাটি, ফসল ও মাছেও কীটনাশক ও ভারী ধাতু থাকতে পারে। এ প্রেক্ষিতে, কৃষি ও শিল্প খাতে সৃষ্ট দূষণের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে উক্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে ৩,৬৩৯ ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে ১,১৬৮টি ফাংগিসাইড ও ১,৯৭৪টি ইনসেক্টিসাইড অন্তর্ভুক্ত। এসব কীটনাশকের অবশেষ মাটি, ফসল ও মাছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিষক্রিয়া ধরে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, কার্বামেট গ্রুপের কীটনাশকের "উইথহোল্ডিং পিরিয়ড" ৩৫-৫০ দিন পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করলে তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তবে কৃষকরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করেন এবং লেবেলে উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করেন না।

২) গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ৩,৬৩৯টি কীটনাশকের দীর্ঘ তালিকা কৃষকদের বিভ্রান্ত করে, ফলে পুরোনো ও কম কার্যকর কীটনাশক বাজারে রয়ে যায়। এছাড়া কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের মধ্যে কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার ও উইথহোল্ডিং পিরিয়ড সম্পর্কে সচেতনতার অভাব প্রকট।

৩) মুন্সীগঞ্জ ও কুষ্টিয়ার মাটি, ফসল ও মাছেও কীটনাশকের মাত্রা সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি পাওয়া যায়, যেমন পেয়ারায় ক্রোমিয়াম ও কলায় সীসার মাত্রা উদ্বেগজনক। এই সংকট মোকাবেলায় কম বিষাক্ত কীটনাশক অনুমোদন, কৃষক-ব্যবসায়ী-ভোক্তাদের প্রশিক্ষণ, ইটিপি ব্যবহারে কঠোরতা, নিয়মিত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং নতুন আইনি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পখাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরি।

৪) টেক্সটাইল শিল্পের ক্ষেত্রে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর উদাহরণে দেখা যায়, ১৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের রাসায়নিক বর্জ্য সরাসরি গোরাল নদীতে ফেলে দেয়। শীতকালে নদীর পানির প্রবাহ কমে গেলে এই বর্জ্যের ঘনত্ব বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছায়। পরীক্ষায় মাটি, ফসল (বেগুন, অরুম, পেঁপে) ও মাছে সীসা, আর্সেনিকের মতো ভারী ধাতুসহ টেক্সটাইল ডাইয়ের অবশেষ পাওয়া গেছে, যা সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (MRL) অতিক্রম করে।

৫) এই সংকট মোকাবেলায় গবেষণায় বেশ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। কীটনাশকের মাননিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন করে স্বল্পমেয়াদি করতে হবে এবং লেবেলে উইথহোল্ডিং পিরিয়ড স্পষ্টভাবে উল্লেখ বাধ্যতামূলক করতে হবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ, আইন প্রণয়ন ও বাজার তদারকি জোরদার করার পাশাপাশি অর্গানোক্লোরিন গ্রুপের কীটনাশক (যেমন DDT) নিষিদ্ধ করতে হবে। টেক্সটাইল শিল্পের জন্য বর্জ্য শোধন প্ল্যান্ট (ETP) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নিয়মিত মাঠপর্যায়ে নজরদারি বাড়াতে হবে।

৬) এছাড়া মিডিয়া, শিক্ষা কার্যক্রম ও গণসচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কীটনাশক ও টেক্সটাইল রাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের জন্য বড় ধরনের হুমকি তৈরি করেছে, যা দূর করতে আইনের কঠোর প্রয়োগ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

৭) এই গবেষণা ফলাফল বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য খাতে নীতিগত সিদ্ধান্ত, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

খ) Survey of E-waste Status in Dhaka City: Environmental Hazard and Treatment Options:

গবেষণার লক্ষ্য:

১) প্রতি বছর কি পরিমাণ ই-বর্জ্য (E-waste) তৈরি হয় তা জানা। বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া এবং এর অভাবগুলো খতিয়ে দেখা;

২) ই-বর্জ্যের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো মূল্যায়ন করা;

পটভূমি:

বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্মুখীন হচ্ছে, যা পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য পরিষেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে তৈরি ইলেকট্রনিক বর্জ্য দেশের জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের জন্য মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা তৈরি করছে। গত দশকে, এটি একটি উন্নয়নশীল সমাজের আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। এর ফলস্বরূপ, ভোক্তা-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত পণ্য অপ্রচলন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে একটি নতুন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে: তা হলো ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্যের ক্রমবর্ধমান হুমকি, যা মূলত পুরোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এটি একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা, সেই সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সুযোগ, যা উৎপাদিত ই-বর্জ্যের পরিমাণ এবং এতে থাকা বিষাক্ত উপাদানের কারণে বাড়ছে। ই-বর্জ্যের মধ্যে লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা এবং অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ ৬০% এর বেশি, যেখানে প্লাস্টিকের পরিমাণ প্রায় ৩০% এবং বিপজ্জনক দূষণকারী উপাদান রয়েছে প্রায় ২.৭০%।

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি নতুন ধারণা। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সম্পদ এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার অবাধে সারাদেশে ই-বর্জ্য অবাধে ফেলা হচ্ছে, যা মানুষ, প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে। এ প্রেক্ষিতে, ঢাকা শহরের ই-বর্জ্যের বর্তমান অবস্থা এবং এর কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো মূল্যায়নের লক্ষ্যে উক্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১.) ঢাকা শহরে কম্পিউটার ও টেলিভিশন থেকে তৈরি হওয়া ই-বর্জ্য নিয়ে এই প্রতিবেদনটি মূলত তৈরি করা হয়েছে। এই জন্য ২৮০টি ইউনিট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.) এই গবেষণায় জানা গেছে, কম্পিউটার আমদানিকারকেরা বছরে ২৭৯,৪৫০টি কম্পিউটার আমদানি করে থাকেন। এবং তারা জানিয়েছেন যে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ জোড়া লাগানোর সময় কোনো ই-বর্জ্য তৈরি হয় না।

৩.) রিটেলার বা ডিলারদের মাধ্যমে বছরে গড়ে ৭৮,২৭৮টি কম্পিউটার বিক্রি করা হয়। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৪৮ জন অ্যাসেম্বলার বছরে ৭০,২০৮টি কম্পিউটার সংযোজন করেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, কম্পিউটার এবং টেলিভিশন থেকে বছরে ১০,১৭১ কেজি ই-বর্জ্য তৈরি হয়। এর মধ্যে কম্পিউটারের বর্জ্য ৮,৭৪৩ কেজি এবং টেলিভিশনের বর্জ্য ১,৪২৮ কেজি।

৪.) গবেষণায় আরো দেখা গেছে অনেক প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা সম্পর্কে অবগত নয় এবং তারা এই বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছে। কারিগরি বিশেষজ্ঞদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে, যাতে তারাও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠান মনে করে যে তাদের চাকরিরত প্রতিষ্ঠানগুলোতে শেখানোর পাশাপাশি এটি তাদের প্রাক-চাকরি পাঠ্যক্রমের অংশ হওয়া উচিত।

৫.) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য স্থানীয় ভাষায় প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি এবং প্রকাশ করা উচিত এবং এটি নিয়মিতভাবে আপডেট করা উচিত।

৬.) সর্বোপরি এই গবেষণায় কার্যকরী ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং নীতি তৈরি করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

গ) Study On Impacts of Cyclone AILA and SIDR on Environment and Ecosystem in the Coastal Areas of Bangladesh:

গবেষণার লক্ষ্য:

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলা ও সিডরের পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

পটভূমি:

২০০৭ সালের নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড় "সিডর" এবং ২০০৯ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় "আইলা" বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে। বরিশাল বিভাগের বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর জেলার ১২টি উপজেলার ২৪টি ইউনিয়ন এবং খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলা এই দুর্যোগে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়-বিশেষত বাঁধ সুরক্ষা ব্যবস্থা, পানি ও স্যানিটেশন, জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উপর।

ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলো জরুরি সহায়তা ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনে এগিয়ে আসে। তবে, এখনো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলা করছে। উদাহরণ স্বরূপ, শুধুমাত্র খুলনার কয়রা উপজেলা থেকেই প্রায় ৪০,০০০ মানুষ স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গেছে, আর পাইকগাছা, দাকোপ এবং বটিয়াঘাটা উপজেলায় যথাক্রমে ৩০,০০০, ১৮,০০০ ও ১২,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থায় সৃষ্ট পরিবর্তন ও প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

<u>গবেষণার ফলাফল:</u>

১) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭) ও আইলা (২০০৯) ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলেছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়, কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বিপর্যয়, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের ঘাটতি, বাস্তুচ্যুতি এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার সংকট-সবই এই দুর্যোগের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ফলাফল।

২) কৃষি, মৎস্য ও খামারভিত্তিক জীবিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। বহু পরিবার আয়ের উৎস হারিয়ে দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়।

৩) সিডর ও আইলার পরে মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় যা এখনও কিছু অঞ্চলে উচ্চমাত্রায় রয়ে গেছে। সাতক্ষীরা ও খুলনায় লবণ সহিষ্ণু ধানের অভাবে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিঠা পানির মাছ চাষ বাধাগ্রস্ত হলেও কিছু এলাকায় চিংড়ি চাষ পুনরায় শুরু হয়েছে।

৩) ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল। খুলনা ও সাতক্ষীরার অনেক মানুষ স্থানান্তরিত হয়ে দুর্বল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে।

৪) গবেষণার ফলাফলটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের পানিতে লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ ও জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নীতিগত পদক্ষেপের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫) সর্বোপরি, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অভিযোজন কৌশল প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থবছর: ২০১১-১২

২০১১-২০১২ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে ২৯ (উনত্রিশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ (একটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা **Environment, Agriculture and Development Servicers Ltd. (EADS) এবং Mark Consultants** যৌথভাবে সম্পাদন করে। নিম্নে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমটির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Environmental Impact Study of Brick Kiln in Dhaka District	EADS (Environment, Agriculture and Development Servicers Ltd.) and Mark Consultants	২৯ লক্ষ টাকা	বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

গবেষণার লক্ষ্য:

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো ঢাকা জেলার বায়ুমানের উপর ইটভাটা থেকে নির্গত দূষণের স্থানিক বণ্টন ও প্রভাব মূল্যায়ন করা।

পটভূমি:

ঢাকা জেলার বায়ুদূষণের একটি বড় উৎস হল পার্শ্ববর্তী উত্তরাঞ্চলীয় সাভার, ধামরাই, দোহার, আশুলিয়া, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কেরানীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ নামক এলাকায় অবস্থিত ৬৫০টিরও বেশি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত কয়লা চালিত ইটভাটা। শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর-এপ্রিল) উত্তর দিকের বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে এগুলোর নির্গত PM, CO, SO_2, NO_x সরাসরি ঢাকায় পৌঁছায়, যা শহরের বায়ু মানকে বিপজ্জনক স্তরে নিয়ে যায়। ঢাকা শহরের আশেপাশে নিচু কৃষি জমিতে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের শুষ্ক শীতকালে শত শত ইটভাটা চালু থাকে এবং বায়ুতে কণা নির্গত করে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই ইটভাটাগুলি গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনেরও প্রধান উৎস, যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এপ্রেক্ষিতে, ঢাকা জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন ইটভাটার থেকে নির্গত দূষণের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) ঢাকা জেলার উত্তরে অবস্থিত ইটভাটা থেকে নির্গত দূষণের কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত চার মাসের গড় হিসাবে, ঢাকা শহরে দূষণের মাত্রা ২৫ থেকে ১০০ $-g/m^3$ এর মধ্যে থাকে।

২) নারায়ণগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ ও রূপগঞ্জ এলাকার ইটভাটাগুলো ঢাকা শহরের বায়ুদূষণে তেমন প্রভাব ফেলে না। তবে গাজীপুর ও সাভার এলাকার ইটভাটাগুলো ঢাকা শহরের বায়ুদূষণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ঢাকা শহরের মধ্যে, মিরপুরের গাবতলীতে মাটি দূষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এর প্রধান কারণ হলো গাবতলী ঘনবসতিপূর্ণ ইটভাটাগুলোর খুব কাছে অবস্থিত।

৩) ইটভাটা থেকে নির্গত দূষণ এখানে ১০০ $-g/m^3$ এরও বেশি। ঢাকা শহরের কেন্দ্র (জিরো পয়েন্ট) ইটভাটা থেকে ২৫ থেকে ৫০ $-g/m^3$ পর্যন্ত দূষণ গ্রহণ করে। অন্যান্য মাসের তুলনায় ডিসেম্বরে ঢাকা শহরের দূষণ পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ থাকে, কারণ এ সময় বায়ু সাধারণত শহরের দিকে প্রবাহিত হয়।

৪) মার্চের দিকে, বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হওয়ায় দূষণ শহরের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যায় এবং উত্তরে বেশি জমা হয়। ফলে, এই মাসে শহরের কেন্দ্র ইটভাটা থেকে খুব কম দূষণ গ্রহণ করে। তবে হয়বত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও উত্তরা এলাকা এই মাসে প্রচুর দূষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৫) মডেলিং থেকে দেখা যায় যে, যদি ইটভাটাগুলো কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে ২৫ কিলোমিটারের বেশি দূরে অবস্থিত হয়, তবে দূষণের প্রভাব নগণ্য থাকে। ইটভাটা থেকে দূষণের প্রধান কারণ হলো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এর উপস্থিতি। যদি ইটভাটাগুলো ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত, তবে দূষণের মাত্রা এত বেশি হতো না।

৬) উক্ত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে জিগজ্যাগ কিলন (Zigzag Kiln) ও VSBK (Vertical Shaft Brick Kiln), টানেল কিলন (Tunnel Kiln), এবং HHK (Hybrid Hoffman Kiln) পদ্ধতির ইটভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনী বিশিষ্ট সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা ও ড্রাম চিমনী ২০১৩ সালে সারাদেশে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অর্থবছর: ২০১২-২০১৩

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ (একটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমটির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Environmental and Morphological Impact Assessment on the Rivers of Sylhet Region due to Mechanical Extraction of Stone, Gravel and Sand	CEGIS	৩০ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

গবেষণার লক্ষ্য:

১) এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ছিল সিলেট অঞ্চল থেকে যান্ত্রিক উপায়ে পাথর, নুড়ি ও বালু উত্তোলনের কারণে নদীর উপর পরিবেশগত ও গঠনগত প্রভাব মূল্যায়ন করা;

২) খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য একটি টেকসই নীতিমালা/গাইডলাইন তৈরি করা;

পটভূমি

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধ ভান্ডার হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রাকৃতিক গ্যাস, কাঁচা তেল, চুনাপাথর, সাদা মাটি, বালি, পিট, কয়লা, নুড়ি পাথর, এবং বালু সহ বিভিন্ন খনিজের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। বিশেষত, নুড়ি পাথর ও বালু নির্মাণশিল্পের জন্য অপরিহার্য এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এই খনিজগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় খনিজ অনুসন্ধান, আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে, যা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে দরিদ্র অঞ্চলের মানুষের জন্য। তবে, সিলেট অঞ্চলে অবৈধ খনিজ উত্তোলনের ফলে বিভিন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। "বোমা মেশিন" (এক্সক্যাভেটর) ব্যবহার করে নদী ও চর থেকে পাথর, নুড়ি ও বালু উত্তোলন করা হচ্ছে, বিশেষ করে জাফলং, তামাবিল, ভোলাগঞ্জ, তাহিরপুর ও ছাতক এলাকায়। এ ধরনের কার্যক্রম নদীর গঠন পরিবর্তন (মরফোলজিক্যাল ইমপ্যাক্ট), জীববৈচিত্র্য হ্রাস, মাটি ও পানির গুণমানের অবনতি এবং স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া, শিশুশ্রমের ব্যবহার এবং শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশও একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)-এর মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীগুলোতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খনিজ উত্তোলনের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) এই গবেষণাটি জাফলং, তামাবিল, ভোলাগঞ্জ (সিলেট জেলা) এবং তাহিরপুর, ছাতক (সুনামগঞ্জ জেলা) যান্ত্রিক পাথর, নুড়ি ও বালি উত্তোলনের পরিবেশগত ও ভূমিরূপগত প্রভাব মূল্যায়ন ও টেকসই খনিজ আহরণের জন্য কারিগরি নির্দেশিকা তৈরি করার জন্য করা হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন খনিজ সম্পদের আধার, যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, পাথর, বালি, নুড়ি ইত্যাদি।

২) জাফলং, তামাবিল, ভোলাগঞ্জ (সিলেট জেলা) এবং তাহিরপুর, ছাতক (সুনামগঞ্জ জেলা) নদী ও চর থেকে অবৈধভাবে যান্ত্রিক উপায়ে (বোমা মেশিন) পাথর ও বালি উত্তোলন চলছে। পিয়াইন, ডাউকি, গোয়াইন ও ঢালাই নদী থেকে এই খনিজ আহরণে নদী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশগত, ভৌত-ভূমিরূপগত ও সামাজিক ক্ষতি হচ্ছে। খনিজ উত্তোলন একদিকে কর্মসংস্থান ও দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখলেও অন্যদিকে নদীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে, নদী ভাঙ্গন বাড়াচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

৩) গবেষণায় মাঠ জরিপ, স্থানীয় জনসাধারণের সাথে পরামর্শ (PCM, PRA, RRA) এবং স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪) গবেষণায় যান্ত্রিক উত্তোলনের ফলে নদীর প্রস্থ বেড়েছে এবং নদীর গঠন পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণ: জাফলং অঞ্চলে নদীর গড় প্রস্থ বছরে প্রায় ৮ মিটার, ঢালাই নদীতে বছরে ১৯ মিটার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে ব্যক্তিগত জমি, কৃষি জমি, স্কুল, কবরস্থান ইত্যাদিতেও খনিজ আহরণ শুরু হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে কৃষিজমির ৫% হারানোর ঝুঁকি ও ২০% জমি ক্ষয়-ভূমি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

৫) নদীর গভীরতা বাড়ার কারণে বন্যা প্রবণতা কিছুটা কমেছে, তবে পরিবেশের ক্ষতি বেড়েছে। বোমা মেশিনের ব্যবহার থেকে শব্দদূষণ ও অন্যান্য দূষণ হচ্ছে, যা বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে।

৬) গবেষণায় কিছু সুপারিশ করা হয়েছে, যেমন- খনিজ উত্তোলনের জন্য শুকনো মৌসুম (নভেম্বর-মার্চ) নির্ধারণ করতে হবে। শুধুমাত্র নির্ধারিত এলাকায় উত্তোলনের অনুমতি থাকতে হবে। কৃষি, পর্যটন ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য ভূমি জোনিং করতে হবে।

৭) ঐতিহ্যবাহী সরঞ্জাম ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে। একটি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) ও পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা (Monitoring Plan) বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮) ২০১৪ সালে উক্ত গবেষণার ফলাফল থেকে বাংলাদেশে পাথর উত্তোলনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে ইংরেজি এবং বাংলায় টেকনিক্যাল গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। যা বর্তমানে পাথর, নুড়ি ও বালু উত্তোলনের কাজে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

অর্থবছর: ২০১৩-১৪

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ (একটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমটির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Development of a GIS based Industrial Database for the Department of Environment	CEGIS (Center for Environmental and Geographic information Services)	৪৯ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

গবেষণার লক্ষ্য:

ঢাকা বিভাগের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের (DoE) পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ কার্যক্রম উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য জিআইএস ভিত্তিক শিল্প ডাটাবেস তৈরি করা এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য । বিশেষ লক্ষ্য সমূহ হল:

- বিদ্যমান শিল্পের ডাটাবেস পর্যালোচনা ও আপডেট করা;
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে ঢাকা বিভাগের "লাল" এবং "কমলা-খ" শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলোর জন্য একটি ভূস্থানিক জরিপ পরিচালনা করা;
- জরিপকৃত তথ্য জিআইএস ভিত্তিক সিস্টেমে সংযুক্ত করে মানচিত্র তৈরি করা এবং বিশ্লেষণ করা;
- পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ডাটাবেস পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

পটভূমি:

বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী এবং ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ ও জলাভূমি এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা এবং সেখান থেকে নির্গত অপরিশোধিত বর্জ্য জলাশয়, কৃষিজমি ও বাস্তুতন্ত্রকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকার নিকটস্থ হওয়ায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সমস্যার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-শিল্প থেকে নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য, ভারী ধাতু ও বিষাক্ত পদার্থের সরাসরি নিষ্কাশন; শিল্পকারখানার সুনির্দিষ্ট তথ্য ও অবস্থানসংক্রান্ত ডাটার অভাব; এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের (DoE)

নজরদারি ও নীতিনির্ধারণে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। ২০০৭-০৮ সালে DoE একটি জিআইএস-ভিত্তিক ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (DSS) তৈরি করলেও সময়ের সাথে সাথে এটি অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা বিভাগের শিল্প এলাকা নিয়ে একটি বিস্তৃত জরিপ এবং জিআইএস-ভিত্তিক ওয়েব-ইনেবলড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) তৈরির এই গবেষণা কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) গবেষণায় ঢাকা বিভাগের ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী এবং ময়মনসিংহ জেলার মোট ১৭,১০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩,০০৯টি প্রতিষ্ঠান চালু, ২,১৮৫টি বন্ধ (স্থায়ী/অস্থায়ী), এবং ১,৭৭৩টি প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

২) শুধুমাত্র ৯% জরিপকৃত শিল্প কারখানা পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে, অর্থাৎ প্রায় ৯০% শিল্প পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন শিল্প স্থাপন বা পুরাতন পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করছে না।

৩) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে **"লাল"** শ্রেণী ২৩% এবং "কমলা-খ" ক্যাটাগরির ২১% প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে । গবেষণায় দেখা যায় মোট ১,৫৬৯টি শিল্প তরল বর্জ্য উৎপাদন করে, কিন্তু মাত্র ৬৩৬ টির বর্জ্য শোধন ব্যবস্থা (ইটিপি) আছে। এদের মধ্যে ৫৪৬টি ইটিপি (ETP) ব্যবহার করে, যার ৯৩% কার্যকর। গ্যাসীয় বর্জ্য শোধনের জন্য ATP ব্যবহার করা হয়, তবে তা নিয়মিত চালু নেই। এছাড়া ৯০৬টি প্রতিষ্ঠান ইটিপি ছাড়াই সরাসরি অপরিশোধিত তরল বর্জ্য নদী বা খালে ফেলে।

৪) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক হলেও ৫৮% কারখানা আইন অমান্য করে বর্জ্য নিষ্কাশন করছে। এইসব কারখানার অধিকাংশই পরিবেশ আইন অনুসরণ করছে না। তবুও মাত্র ১৭৮টি কারখানাকে প্রথমবারের মতো নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

৫) বায়বীয় বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত ৬০% কারখানায় চিমনি রয়েছে। গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার কারখানাগুলো শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সাইলেন্সার ব্যবহার করছে, যা অন্যান্য জেলার তুলনায় উল্লেখযোগ্য।

৬) গবেষণায় GIS-ভিত্তিক ডাটাবেস (MySQL 5.6) এবং ব্যবহারকারীবান্ধব ইন্টারফেস (.NET ও ASP.NET) তৈরি করা হয়েছে।

৭) ডিজিটাল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিল্প মালিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও আপডেট করা হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বাস্তব সময়ে ডাটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আই-ট্যাব ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শকরা তথ্য আপডেট করতে পারবেন। সর্বোপরি এই গবেষণা শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও টেকসই শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করবে।

অর্থবছর: ২০১৪-১৫

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় চট্টগাম বিভাগে বিভিন্ন শিল্প কারখানার উপর মোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) লক্ষ ব্যয়ে ১ (একটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমটির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Development of GIS based Industrial Database for the Department of Environment for Chittagong Division	CEGIS	৪৯ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

গবেষণার লক্ষ্য:

চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের (DoE) পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ কার্যক্রম উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য জিআইএস ভিত্তিক শিল্প ডাটাবেস তৈরি করা এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষ লক্ষ্যসমূহ হল:

১. বিদ্যমান শিল্পের ডাটাবেস পর্যালোচনা ও আপডেট করা;

২. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে চট্টগ্রাম বিভাগের **"লাল"** এবং **"কমলা-খ"** শ্রেণীর শিল্পগুলোর জন্য একটি ভূস্থানিক জরিপ পরিচালনা করা;

৩. জরিপকৃত তথ্য জিআইএস ভিত্তিক সিস্টেমে সংযুক্ত করে মানচিত্র তৈরি করা এবং বিশ্লেষণ করা;

৪. পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ডাটাবেস পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

পটভূমি:

বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিভাগের গ্রামীণ, জলাভূমি ও পাহাড়ি এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা এবং সেখান থেকে নির্গত অপরিশোধিত বর্জ্য জলাশয়, কৃষিজমি ও বাস্তুতন্ত্রকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকার নিকটস্থ হওয়ায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্যার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-শিল্প থেকে নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য, ভারী ধাতু ও বিষাক্ত পদার্থের সরাসরি নিষ্কাশন, শিল্পকারখানার সুনির্দিষ্ট তথ্য ও অবস্থানসংক্রান্ত ডাটার অভাব, এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের (DoE) নজরদারি ও নীতিনির্ধারণে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। ২০০৭-০৮ সালে DoE একটি জিআইএস-ভিত্তিক ডিসিশন সাপোর্ট

সিস্টেম (DSS) তৈরি করলেও সময়ের সাথে সাথে এটি অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রাম বিভাগের শিল্প এলাকা নিয়ে একটি বিস্তৃত জরিপ এবং জিআইএস-ভিত্তিক ওয়েব-ইনেবলড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) তৈরির জন্য গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়।

গবেষণার ফলাফল:

১) এই গবেষণায় চট্টগ্রাম বিভাগের ৯টি জেলা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার এবং খাগড়াছড়ি জুড়ে মোট ৩,০৬৫টি শিল্প কারখানার উপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে, জরিপকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১,৮৫৭টি কমলা-খ (Orange-B) শ্রেণিতে এবং ২২৮টি লাল (Red) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই শ্রেণিবিন্যাস শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশগত প্রভাবের মাত্রা নির্দেশ করে, যেখানে লাল শ্রেণির শিল্পগুলোকে উচ্চ পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা চট্টগ্রামে (১,৭৬৬টি) অবস্থিত। এরপর রয়েছে কুমিল্লা (৪০৫টি), ফেনী (২৫৮টি), নোয়াখালী (২৫২টি) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৫৮টি)। এই তথ্যগুলো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর শিল্পঘনত্বকে নির্দেশ করে।

৩) সার্ভে করা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২,০৮৫টি বর্তমানে চালু রয়েছে। ৫৬২টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ, ১২৭টি সাময়িকভাবে বন্ধ, এবং ৬৮টি নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া, ২২৩টি প্রতিষ্ঠান তাদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়নি।

৪) গবেষণায় দেখা যায় ৭০% শিল্প ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে এবং ৫৪% শিল্প বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিড থেকে নেয়।

৫) তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মাত্র ১৯.৮% শিল্পের নিজস্ব Effluent Treatment Plant (ETP) রয়েছে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সার্বিক অবস্থা দুর্বল। পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance) মাত্র ৩৭% শিল্পের আছে।

৬) নতুনভাবে GIS ভিত্তিক Industrial Management Information System (IMIS) তৈরি করা হয়েছে, যা সহজে আপডেট করা যাবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

৭) গবেষণায় GIS-ভিত্তিক ডাটাবেস (MySQL 5.6) এবং ব্যবহারকারীবান্ধব ইন্টারফেস (.NET ও ASP.NET) তৈরি করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিল্প মালিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও আপডেট করা হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বাস্তব সময়ে ডাটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আই-ট্যাব ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শকরা তথ্য আপডেট করতে পারবেন।

৮) সর্বোপরি, এই গবেষণা চট্টগ্রাম বিভাগের শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং টেকসই শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করবে। এর মাধ্যমে শিল্পকারখানার প্রভাব, বর্জ্য নিষ্কাশন এবং পরিবেশগত ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। এটি পরিবেশবান্ধব শিল্পনীতি প্রণয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সচেতন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ফলে, চট্টগ্রাম বিভাগের শিল্প উন্নয়ন ও পরিবেশের সুষ্ঠু সমন্বয় সম্ভব হবে।

অর্থবছর: ২০১৫-১৬

২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ (তিনটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ যথাক্রমে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) (২টি) এবং জনাব মোঃ শাহজাহান, প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর নামক ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Geospatial Technology based Water Quality Monitoring System for Bangladesh	CEGIS	৪০ লক্ষ টাকা	ঢাকা গবেষণাগার	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
খ)	Updating of Environmental Impact Assessment (EIA) Guidelines and One Guide for Assessment of Effluent Treatment Plant (ETP)	জনাব মোঃ শাহজাহান প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর	৫ লক্ষ টাকা	পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
গ)	Assess the Climate Change Effects on Marginal Farmers of Northern Bangladesh	CEGIS	৫ লক্ষ টাকা	জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

ক) **(Geospatial Technology based Water Quality Monitoring System for Bangladesh)**

গবেষণার লক্ষ্য:

বাংলাদেশে পানির গুণগতমানের পরীক্ষার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক এবং ভূ-স্থানিক (Geo-spatial) প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি সিস্টেম তৈরি করা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। এটি বিভিন্ন খাত যেমন পানীয়, কৃষি, মৎস্য এবং শিল্পক্ষেত্রের জন্য পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো:

১. বিদ্যমান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং পানির গুণগতমানের মূল্যায়ন;

২. ভূ-স্থানিক (Geo-spatial) প্রযুক্তি এবং ওয়েব-সমর্থিত পানির গুণগতমানের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি;

৩. পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

৪. পানির নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রটোকল এবং নির্দেশিকা তৈরি;

পটভূমি:

বাংলাদেশে পানিসম্পদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা দেশের পরিবেশ ও মানবিক জীবনযাত্রার জন্য অপরিহার্য। তবে, দ্রুত শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে পানিসম্পদের মান দ্রুত অবনতি ঘটছে। দেশের প্রধান নদী এবং জলাশয়গুলোতে শিল্প বর্জ্য, কৃষি দূষণ এবং গৃহস্থালি বর্জ্য নিঃসরণের ফলে পানি দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দেশের বৃহৎ শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের নদী এবং জলাশয়গুলোর পানি বর্তমানে অত্যন্ত দূষিত। বিশেষ করে, চট্টগ্রাম বিভাগের নদীগুলোর অবস্থা আশঙ্কাজনক, যেখানে শিল্পকারখানার বর্জ্য, স্লাম এলাকা, বাজার এবং অন্যান্য উৎস থেকে বর্জ্য স্রোতের মাধ্যমে নদী ও জলাশয়ের পানির মান হ্রাস পাচ্ছে।

দেশের কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি এবং একাধিক খনিজ এবং শিল্পক্ষেত্রের কারণে জলাশয় ও নদীর পানি দূষণ একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষির কারণে নদী এবং খালের পানি দূষণ যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি শিল্প বর্জ্য নিঃসরণ ও এক প্রধান সমস্যা। বিশেষত, যেসব শিল্প কারখানা সঠিকভাবে Effluent treatment plant (ETP) স্থাপন করেনি, তাদের দ্বারা নিঃসৃত বর্জ্য সরাসরি নদীতে প্রবাহিত হয়, যা পানির গুণমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাছাড়া, বৃষ্টির মৌসুমে পানি দূষণ আরো তীব্র হয়ে ওঠে, যখন শহরাঞ্চলে বন্যা, প্লাবন এবং অন্যান্য দূষণ উৎসের কারণে পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, নদী, খাল, জলাশয় এবং জলাবদ্ধ এলাকাগুলোর উপর অবৈধ দখল এবং ভরাট বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই দখলদারির কারণে নদীগুলোর প্রবাহ রোধ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। নদী ও জলাশয়ের পানির গুণগত মানের অবনতির ফলে শ্বাস প্রশ্বাসের রোগ, জলবাহিত রোগ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষাপটে, পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) ওয়েব-ভিত্তিক এবং ভূ-স্থানিক

(Geo-spatial) পদ্ধতির মাধ্যমে নদী ও জলাশয়ের পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) গবেষণায় হটস্পট বিশ্লেষণ, DEM (Digital Elevation Model), এবং ক্যাচমেন্ট এলাকা চিহ্নিত করতে GIS সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। পানির মানের ডেটা সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য একটি ওয়েব-এনাবল্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহের জন্য একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপ করা হয়েছে।

২) পয়েন্ট ও নন পয়েন্ট ও দূষণের উৎস চিহ্নিত করতে Geo-spatial টেকনোলজি (ArcMap, Erdas Imagine) ব্যবহার করা হয়েছে।

৩) গবেষণায় ২৭টি নদীর বিদ্যমান ৬৬টি পানির নমুনা সংগ্রহ পয়েন্টের অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। দূষণের উৎস বিবেচনায় গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ৩০টি নদীর ৯৯টি পয়েন্ট থেকে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুপারিশ করা হয়েছে।

৪) নদীর পানির pH, DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TDS (Total Dissolved Solids), এবং Chloride পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পদ্মা, যমুনা, রূপসা এবং অন্যান্য নদীর বিভিন্ন স্থানে pH মান ৮.২-৮.৪ এর মধ্যে পাওয়া গেছে, যা অভ্যন্তরীণ বাস্তুসংস্থানের জন্য স্বাভাবিক। Dissolved Oxygen (DO) প্রায় সব স্থানে ৫ মিগ্রা/লিটার এর ওপরে ছিল, যা মাছের জন্য উপযোগী। BOD এর মান কিছু ক্ষেত্রে আদর্শ মানের (≥৬ মিগ্রা/লিটার) থেকে বেশি ছিল, যা দূষণের ইঙ্গিত দেয়। কৃষি, শিল্প ও শহুরে বর্জ্যের কারণে দূষিত স্থানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫) দূষণের প্রধান উৎস হিসেবে পয়েন্ট এবং নন-পয়েন্ট দূষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি ভূ-স্থানিক এবং ওয়েব-ভিত্তিক পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যা ডেটা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে সহায়ক।

৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে।

৭) গবেষণায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ পানির গুণগতমান পুনর্মূল্যায়ন এবং বিশেষ ব্যবহার যেমন কৃষি, মাছ চাষ, ও পানীয় জলের মান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৮) গবেষণা থেকে সুপারিশের ভিত্তিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০টি নদীর ৯৯টি পয়েন্ট থেকে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯) গবেষণায় কিছু ক্ষেত্রে, পরিবেশ অধিদপ্তর একই স্থান থেকে তিনটি নমুনা সংগ্রহ করে, যা আর্থিক এবং সময় সাপেক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০) এছাড়াও, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর পানির গুণগত মানের প্যারামিটারসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন প্যারামিটার এবং তাদের আদর্শ মান নির্ধারণ করে মার্চ, ২০২৩ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত পানির গুণগত মানের প্যারামিটারসমূহ অনুযায়ী নদীর পানি সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

খ) Updating of Environmental Impact Assessment (EIA) Guidelines and One Guide for Assessment of Effluent Treatment Plant (ETP)

গবেষণার লক্ষ্য:

- পূর্বের Environmental Impact Assessment (EIA) Guidelines সংশোধন করে ৮টি নতুন (EIA) Guidelines প্রস্তুত করা;
- ১টি Guide of Assessment of Effluent Treatment Plant (ETP) সংশোধন ও পরিমার্জন করা;
- শিল্প বর্জ্য দ্বারা জলাধার ও পরিবেশ দূষণ রোধ করে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

পটভূমি:

ইআইএ (EIA) হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করে এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীনে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance Certificate-ECC) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । ইআইএকে প্রকল্পের শুরুতেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে প্রকল্প পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবর্তন ও করণীয় ব্যবস্থা যুক্ত করা যায়। Stakeholder অংশগ্রহণ এবং Public Consultation গুরুত্বপূর্ণ, যাতে স্বচ্ছতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত হয়।

"ETP Assessment Guide" এর মাধ্যমে শিল্পখাতের তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের (DOE) কর্মকর্তাদের জন্য একটি সংগঠিত, ধাপে ধাপে মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্জ্য শোধনাগার (ETP) ডিজাইন, কার্যকারিতা ও পরিবেশগত মানদণ্ড মেনে চলার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। এই গাইডে ETP নকশা যাচাই, জাতীয় নির্গমন মানদণ্ড নির্ধারণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের নকশা ও অপারেশন গাইডলাইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে ETP পরিকল্পনা, পরিদর্শন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ১২ অনুযায়ী, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance) গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এই আইনের আলোকে (EIA) ও বর্জ্য

পরিশোধন প্ল্যান্ট (ETP) সংক্রান্ত সঠিক নির্দেশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন করে ৮টি EIA গাইডলাইন এবং ১টি ETP অ্যাসেসমেন্ট গাইড অধিকতর সংশোধন, আধুনিকীকরণ ও পরিবর্ধনের জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) গবেষণায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কিভাবে EIA করতে হবে, তার বিভিন্ন ধাপের নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে যেমন- Screening, Scoping, Baseline Data Collection, Impact Assessment, Mitigation Planning ইত্যাদি।

২) বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে ও নীতিমালা অনুসরণ করে পরিবেশ ছাড়পত্র (ECC) পাওয়ার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩) প্রকল্পের পরিবেশগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে করণীয় কর্মকান্ডের যেমন-Mitigation, Monitoring, Emergency Planning এর পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে।

৪) কিভাবে সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাদের সাথে পরামর্শ করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে তার একটি কাঠামো (Consultation Process) নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য EIA রিপোর্ট কেমন হবে তার কাঠামো, বিষয়বস্তু এবং গুণগত মানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৫) পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) কিভাবে প্রস্তাবিত ইআইএ (EIA) প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে, এবং কোন মানদণ্ডে অনুমোদন দেবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভালো মানের ইআইএ (EIA) সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (capacity building) বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

৬) গবেষণায় পরিবেশ অধিদপ্তরের (DOE) কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তুত একটি স্ট্যান্ডার্ড মূল্যায়ন পদ্ধতি যা শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য শোধনাগার (ETP) ডিজাইন এবং কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে।

৭) ETP ডিজাইন যাচাই করার ধাপে বিভিন্ন ধাপ উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন Equalization Tank, Aeration Tank, Clarifier, Sludge Handling System ইত্যাদি।

৮) তরল ও তরল বর্জ্য পরিমাণ এবং গুণগত মান মূল্যায়নের ফর্মুলা ও মানদণ্ড প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন, Hydraulic Retention Time (HRT), Volumetric Loading, Solid Retention Time (SRT), F/M ratio ইত্যাদি।

৯) National Discharge Standards) তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন BOD, COD, TSS, pH, Oil, ও Gresse ইত্যাদি। এই গাইডটি একটি কার্যকর টুলকিট যা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা শিল্প-কারখানার তরল বর্জ্য শোধনাগারের কার্যকারিতা যাচাইয়ে ব্যবহার করতে পারেন, এবং এটি সততা, নির্ভুলতা ও পরিবেশগত মানদণ্ড বজায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

১০) বর্তমানে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ৮ টি সংশোধিত ইআইএ (EIA) গাইডলাইনগুলো এবং ১টি সংশোধিত ইটিপি (ETP) অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুসারে "কমলা" ও "লাল" শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ) Assess the Climate Change Effects on Marginal Farmers of Northern Bangladesh:

গবেষণার লক্ষ্য:

গবেষণার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ করা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো:

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তনশীলতা ও কৃষির উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
- ফসল উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রান্তিক কৃষকদের পেশা, জীবনধারা ও অভিযোজন কৌশলগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা মূল্যায়ন করা।

পটভূমি:

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে। কৃষি এদেশের অর্থনীতির মূল জিডিপিতে যার অবদান ২০.৮৩% এবং ৪৮% শ্রমশক্তি এ খাতে নিয়োজিত। তবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি (২০৩০ নাগাদ ১±C, ২০৫০তে ১.৪±C) ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত কৃষি উৎপাদনকে হুমকির মুখে ফেলেছে। বিশেষ করে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে খরার প্রভাবে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা উত্তরাঞ্চলে কৃষি সংকটকে তীব্র করেছে। এছাড়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে ধানের উৎপাদন কমছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব কৃষকদের আয় কমিয়ে দিচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য বাড়িয়ে তুলছে। টেকসই কৃষি পদ্ধতি ও অভিযোজন কৌশল এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি। এই প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এই গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

গবেষণার ফলাফল:

এই গবেষণায় AgMIP Climate Scenario Generation Tools with R (ACSGTR 2.2) **(একটি R প্রোগ্রামিং-ভিত্তিক টুল যা কৃষিখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিস্থিতির ডেটা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।)** ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছে। জলবায়ু পূর্বাভাসের জন্য পাঁচটি গ্লোবাল ক্লাইমেট মডেল (GCM)-CCSM4, GFDL-ESM2M, HadGEM2-ES, MIROC5 এবং MPI-ESM-MR0 এর এনসেম্বল ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে। ডাউনস্কেলিং পদ্ধতিতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেল্টা মেথড ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের স্থানীয় পূর্বাভাস তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণায় দুইটি নিঃসরণ পরিস্থিতি RCP4.5 (মধ্যম) ও RCP8.5 (উচ্চ) এর অধীনে মধ্য শতাব্দীর (2041–2070) জলবায়ু পরিস্থিতিকে বেসলাইন (1981-2010) সময়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফসলভিত্তিক (আউশ, আমন, বোরো ও রবি) মৌসুমে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের পরিবর্তন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন, সেচের চাহিদা ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতির মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিম্নে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো-

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কৃষির ওপর স্পষ্টভাবে পড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরার মাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের হ্রাস কৃষকের ফসল উৎপাদন ও জীবিকার উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি গরম দিন, দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুম এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২. **ফসল উৎপাদনে প্রভাব:**

তাপমাত্রার অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে ধান ও গমের মতো ফসলের ফলন হ্রাস পাচ্ছে। ধানের ফুলে যখন তাপমাত্রা ৩৫±C ছাড়িয়ে যায় তখন তা স্টেরিল (বন্ধ্যা) হয়ে পড়ে এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। গমের ক্ষেত্রে ৩০±C তাপমাত্রাতেই স্টেরিলিটি দেখা দেয়। অতএব, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শস্যের প্রজনন ও ফলনে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটছে।

৩. পানি সংকট ও সেচ সমস্যা:

বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির প্রধান উৎস ভূগর্ভস্থ পানি, যা বিগত ৩০ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে নেমে গেছে (১১ মিটার থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত)। এই কারণে সেচে ব্যয় বাড়ছে এবং অনেক জমি অনাবাদি থেকে যাচ্ছে। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় পানির অভাব কৃষিকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

৪. অর্থনৈতিক প্রভাব:

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরা ও রোগবালাইয়ের কারণে কৃষকের খরচ বেড়েছে, বিশেষ করে শ্রম ও সারের ব্যয়ে। প্রায় ৮% খরচ বৃদ্ধি পাওয়া গেছে। খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়া এবং ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কৃষকের আয় কমে গেছে, এবং অনেক প্রান্তিক কৃষক বাধ্য হয়ে শহরে অভিবাসনে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

৫. জীবিকা ও পেশা পরিবর্তন:

কম পানি চাহিদাসম্পন্ন এবং লাভজনক ফসলের দিকে ঝুঁকছেন কৃষকরা। আম ও পেয়ারা চাষ জনপ্রিয় হচ্ছে কারণ এগুলো তুলনামূলকভাবে কম পরিশ্রমসাধ্য, বেশি লাভজনক এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য উপযোগী। কৃষকদের একটি বড় অংশ ধানচাষ ছেড়ে ফল বাগান বা মৌসুমি ব্যবসার দিকে যাচ্ছে।

৬. নারী ও পরিবারভিত্তিক অবদান:

নারীরা গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন এবং ফসলের পরবর্তী ধাপে (যেমন: শুকানো, সংরক্ষণ) যুক্ত হচ্ছেন। যদিও নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাদের উপরও মানসিক ও শারীরিক চাপ বাড়ছে। মহিলারা প্রায়শই খাদ্য সংকটকালে পারিবারিক খরচ সামাল দিতে নানাবিধ পথ অনুসরণ করেন।

৭. **রোগবালাই ও পোকার প্রাদুর্ভাব:**

বর্ধিত তাপমাত্রা ও অনিয়মিত আর্দ্রতার ফলে ধানের ক্ষেত্রে ইয়োলো স্টেম বোরার, ব্রাউন প্লান্ট হপার ও গ্রিন মিরিড বাগ-এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ফসল উৎপাদনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে এবং উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৮. অভিযোজন কৌশল:

কৃষকরা বর্তমানে কম পানি প্রয়োজন এমন ফসল যেমন ডাল, গম, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদির চাষে আগ্রহী। সরকারি উদ্যোগে (যেমন DAE-Department of Agricultural Extension) এর মাধ্যমে) জলাধার খনন ও বিকল্প সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। কৃষকরা নিজেরা কৌশলে মৌসুমি পেশা পরিবর্তন, ঋণ গ্রহণ ও বিকল্প আয়ের পথ অনুসরণ করছেন।

অর্থবছর: ২০১৬-১৭

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ (দুইটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Performance Evaluation of Zero Liquid Discharge-Effluent Treatment Plants (ZLD-ETPS) In Textile Industries of Bangladesh	BUET	৩০ লক্ষ টাকা	পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
খ)	Environment Friendly Reuse of Steel Slag as Construction Material	BUET	২০ লক্ষ টাকা	পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

ক) Performance Evaluation of Zero Liquid Discharge-Effluent Treatment Plants (ZLD-ETPS) In Textile Industries of Bangladesh:

গবেষণার লক্ষ্য:

গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পে দূষণ কমাতে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় Zero Liquid Discharge কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। একই সাথে, এই গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত পরিশোধিত পানির পুনঃব্যবহার এবং শূন্য তরল নির্গমন (Zero Liquid Discharge - ZLD) ব্যবস্থা স্থাপনের সময়সীমা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

পটভূমি:

টেক্সটাইল শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখে। তবে এই শিল্প একই সাথে প্রচুর পরিমাণে পরিবেশ দূষণও করে। শিল্পটি তার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে সম্পদ (যেমন - শক্তি, পানি এবং রাসায়নিক দ্রব্য) ব্যবহার করে এবং এর ফলে প্রচুর পরিমাণে দূষিত তরল বর্জ্য তৈরি হয়, যা জমি বা ভূগর্ভের পানির সাথে মিশে পরিবেশ, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাস্তুসংস্থানের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর, দূষণ কমাতে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলো পরিবেশ-বান্ধব করতে বিভিন্ন শিল্পের জন্য থ্রি-আর (3R) কৌশল এবং জিরো ডিসচার্জ (Zero Discharge) পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই থ্রি-আর কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে অপটিমাইজেশন,

সংশোধন এবং পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার করে রিসোর্স এর ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহার করা এবং রিসাইকেল করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন টেক্সটাইল শিল্প তাদের নিজ নিজ থ্রি-আর পরিকল্পনা পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দিয়েছে, যেখানে তরল বর্জ্য নির্গমণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, শিল্পগুলোকে তাদের বিদ্যমান পরিশোধন ব্যবস্থার সাথে আরও উন্নত প্রযুক্তি যুক্ত করতে হবে, যাতে তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গত না হয়ে প্রায় শতভাগ পুনরায় ব্যবহার করা যায়। তারই প্রেক্ষিতে, এই গবেষণাটি বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পে (ডাইং) শূন্য তরল নির্গমন (Zero Liquid Discharge - ZLD) ব্যবস্থা ভিত্তিক ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP)-এর কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১. **কারখানার শ্রেণিবিন্যাস:**

গবেষণায় মোট ২০টি টেক্সটাইল (ডাইং) কারখানা নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১০টি কারখানা জিরো লিকুইড ডিসচার্জ (ZLD) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা জমা দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন পেয়েছে। অপরদিকে, বাকি ১০টি কারখানায় কেবল প্রচলিত ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) রয়েছে, কিন্তু কোনো জিরো লিকুইড ডিসচার্জ ZLD পরিকল্পনা নেই।

২. **প্রযুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:**

১০টি অনুমোদিত ZLD-ETP কারখানার মধ্যে কেবল একটি কারখানা (Z-10) রিভার্স অসমোসিস (RO) প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করেছে এবং তা প্রায় ৬৩% পানি পুনর্ব্যবহার করছে। বাকি ৯টি শিল্প এখনও পূর্ণাঙ্গ ZLD প্রযুক্তি বাস্তবায়নে পিছিয়ে আছে। অধিকাংশ কারখানায় ETP ব্যবস্থায় BOD ও COD মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এলেও TDS ও DO সীমার মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি।

৩. **3R পরিকল্পনার বিশ্লেষণ:**

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কারখানাগুলোর 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ভিত্তিক পরিকল্পনাগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে ZLD অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রযুক্তিগত প্রস্তাবনা, বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং সম্ভাব্য ফলাফলগুলো উঠে এসেছে।

৪. **ZLD-ETP এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন:**

প্রতিবেদনটিতে নির্বাচিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ZLD-ETP ব্যবস্থার ডিজাইন লে-আউট, বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রচলিত ETP ও ZLD প্রযুক্তির মধ্যে কর্মক্ষমতা তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দূষণ অপসারণের দক্ষতা এবং পরিশোধিত পানির পুনঃব্যবহারযোগ্যতার পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. ZLD বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:

গবেষণায় ZLD প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন:

- প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা
- কারখানা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব
- বাড়তি কঠিন বর্জ্য (স্লাজ), রিজেক্ট পানি ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা

৬. **চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ:**

গবেষণার ভিত্তিতে নিচের সুপারিশগুলো প্রদান করা হয়েছে:

- পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রতিটি কারখানার ইনলেট ও আউটলেটে ফ্লো মিটার ডিভাইস স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পানি পুনর্ব্যবহার পরিমাপ করা যায়।
- সরকারকে ভর্তুকি বা সহজ শর্তে ঋণের মাধ্যমে শিল্পখাতে ZLD প্রযুক্তি বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- শিল্প-কারখানার ইটিপি থেকে প্রাথমিকভাবে পরিশোধিত তরল বর্জ্য যদি একটি কেন্দ্রীভূত ZLD (Zero Liquid Discharge) ব্যবস্থায় পুনরায় পরিশোধন করা হয়, তাহলে ব্যয় হ্রাস পাবে এবং পরিবেশ আরও নিরাপদ থাকবে বলে গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছে।

খ) Environment Friendly Reuse of Steel Slag as Construction Material:

<u>গবেষণার লক্ষ্য:</u>

১) এই গবেষণাটির লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের ইস্পাত কারখানাগুলোতে উৎপাদিত স্ল্যাগের প্রকৃতি পরীক্ষা করা;

২) নির্মাণ খাতের জন্য কিছু ব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদনে এর সম্ভাব্য ব্যবহার বিবেচনা করা;

<u>পটভূমি:</u>

ইস্পাত শিল্পে উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হওয়া স্ল্যাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য উপাদান, যা পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইস্পাত উৎপাদন বাড়ছে, এবং এর সাথে সাথে স্ল্যাগের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এই স্ল্যাগ সাধারণত মাটি ভরাটের কাজে ব্যবহৃত হয়, যা পরিবেশ-বান্ধব নয়। তবে, স্ল্যাগে মূল্যবান উপাদান থাকে এবং এটিকে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা সম্ভব। উন্নত দেশগুলো প্রায় শতভাগ স্ল্যাগ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সুবিধা লাভ করছে। এই বাস্তবতায়, বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্পে উৎপন্ন স্ল্যাগের সঠিক ব্যবহার এবং পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্ল্যাগকে একটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত করার পথ খুঁজে বের করা সম্ভব।

গবেষণার ফলাফল:

১. স্টিল স্ল্যাগের উৎপাদন ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে স্টিল উৎপাদনের সময় ইন্ডাকশন ফার্নেস (IF) এবং ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস (EAF) থেকে যথাক্রমে ৬–৮% এবং ২০% হারে স্ল্যাগ তৈরি হয়। IF স্ল্যাগে CaO (লাইম) এর পরিমাণ কম থাকলেও EAF স্ল্যাগে তা তুলনামূলকভাবে বেশি। উপাদানের দিক থেকে, IF স্ল্যাগে প্রধানত Fe_3O_4 ও SiO_2 বিদ্যমান, যেখানে EAF স্ল্যাগে CaO প্রধান উপাদান হিসেবে থাকে।

২. কংক্রিটে স্ল্যাগের ব্যবহার

গবেষণায় দেখা গেছে, IF স্ল্যাগ ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৩৬৯৯ psi কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ পাওয়া গেছে, যা ১০০% স্ল্যাগ ব্যবহারে অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে, EAF স্ল্যাগ ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৫৮৫০ psi শক্তি অর্জন সম্ভব হয়েছে, যেখানে ৭৫% স্ল্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফলাফল ইঙ্গিত করে যে, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে EAF স্ল্যাগ IF স্ল্যাগের তুলনায় অধিক কার্যকর।

৩. ইট তৈরিতে স্ল্যাগের ব্যবহার

IF স্ল্যাগ দিয়ে তৈরি ইটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ ছিল ৭০ kg/cm^3, যা দ্বিতীয় শ্রেণির পোড়া ইটের মানের সমান। অন্যদিকে, EAF স্ল্যাগ দিয়ে তৈরি ইটের স্ট্রেংথ ছিল ১৬৫ kg/cm^3, যা প্রথম শ্রেণির ইটের চেয়েও উন্নত। এই ইট পোড়াতে হয় না, ফলে তাপজ উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না এবং CO_2 নির্গমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

৪. পরিবেশগত সুবিধা

স্ল্যাগ ব্যবহার করে কংক্রিট ও ইট উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটি ও পাথর সংরক্ষণ করা সম্ভব। তদুপরি, পোড়া ইটের বিকল্প হিসেবে স্ল্যাগ-ভিত্তিক ইট ব্যবহারে নির্মাণখাতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পায়, যা পরিবেশের জন্য ইতিবাচক।

৫. সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণা

যদিও স্ল্যাগের ব্যবহার উৎসাহব্যঞ্জক, তবে দীর্ঘমেয়াদে বিশেষ করে EAF স্ল্যাগের উচ্চ CaO উপাদানের কারণে কংক্রিটের স্থায়িত্ব মূল্যায়ন জরুরি। এছাড়াও, সালফেট ও সমুদ্রের পানির প্রভাব, অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অন্যান্য পরিবেশগত ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৬. সুপারিশ: গবেষণায় স্ল্যাগের পরিমাণ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর ব্যবহার নির্ধারণ এবং রাস্তা ও নির্মাণ কাজে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। স্ল্যাগের ব্যবহার বাড়িয়ে কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং অন্যান্য দেশে এর ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত জরিপ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থবছর: ২০১৭-১৮

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ (দুইটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ যথাক্রমে যথাক্রমে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) ও Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Assessment of Generation of E-waste, Its Impacts on Environment and Resource Recovery Potential in Bangladesh	BUET	৩৯ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
খ)	Environmental Impact Study of Two Tannery Estates on the Buriganga and the Dhaleswari River	CEGIS	১০ লক্ষ টাকা	ঢাকা গবেষণাগার	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

ক):(Assessment of Generation of E-waste, Its Impacts on Environment and Resource Recovery Potential in Bangladesh):

গবেষণার লক্ষ্য:

এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ;

(১) বাংলাদেশে ই-ওয়েস্টের (E-waste) পরিমাণ নিরূপণ এবং তার ভবিষ্যৎ প্রবণতা নির্ধারণ;

(২) ই-ওয়েস্টের (E-waste) মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা;

(৩) ই-ওয়েস্ট (E-waste) থেকে মূল্যবান ধাতু পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা;

(৪) ড্রাফট ই-ওয়েস্ট (E-waste) ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০১৭ দ্রুত কার্যকর করা;

পটভূমি:

বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়ছে, যার ফলে ইলেকট্রনিক বর্জ্য (ই-বর্জ্য) এর পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ই-বর্জ্যে বিদ্যমান বিষাক্ত উপাদানসমূহ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হলেও, এর মধ্য দিয়ে মূল্যবান সম্পদ পুনরুদ্ধারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশে ই-

বর্জ্যের ((E-waste)) পরিমাণ নির্ধারণ, এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্য কৌশল মূল্যায়নের লক্ষ্যে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ২০১৮ সালে উৎপন্ন ই-বর্জ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ০.৪ মিলিয়ন টন, যা ২০৩৫ সালের মধ্যে ৪.৬২ মিলিয়ন টনে পৌঁছাতে পারে (বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ২০%) । টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ফ্যান ও বাল্ব ইত্যাদি ই-বর্জ্যের প্রধান উৎস।

২) বর্তমানে মাত্র ৩% ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার হয়, বাকি ৯৭% অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলা হয়, যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শিশু ও তরুণরা বিষাক্ত ধাতুর সংস্পর্শে এসে ক্যান্সারসহ নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার ফলে বায়ু, মাটি ও পানি দূষিত হয়ে খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করছে। তবে, সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ই-বর্জ্য থেকে স্বর্ণ, রূপা, তামা ও টিনসহ মূল্যবান ধাতু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

৩) গবেষণার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরভাবে উন্নত করতে হলে সর্বপ্রথম সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে এবং অবৈধভাবে ই-বর্জ্য ফেলার প্রবণতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় আইন প্রয়োগ ও মনিটরিং জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি, ই-বর্জ্যের পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (Recycling) প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে একদিকে পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস পায় এবং অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। যা বাংলাদেশে ই-বর্জ্য **(E-waste)** ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে এ বিষয়ে একাধিক প্রকল্প/গবেষণার কার্যক্রম বর্তমানে চালু রয়েছে ।

খ) Environmental Impact Study of Two Tannery Estates on the Buriganga and the Dhaleswari River:

গবেষণার লক্ষ্য:

এই গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো নিম্নরুপ:

১. বর্তমানে ব্যবহৃত ট্যানারি পরিচালনার পদ্ধতি এবং সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট টিট্রমেন্ট প্ল্যান্ট (CETP)-এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন;

২. সাভার ট্যানারি এস্টেটের কারণে ধলেশ্বরী নদীর উপর সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ;

৩. পার্শ্ববর্তী পরিবেশ রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চিহ্নিত করা;

৪. টেকসই ট্যানারি শিল্প পরিচালনার জন্য ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ;

পটভূমি:

ট্যানারি শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে রপ্তানি খাতে। ঢাকার হাজারীবাগ ছিল ট্যানারি শিল্পের কেন্দ্র, তবে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এটি পরিবেশ দূষণ করত। এই দূষণ কমাতে সরকার হাজারীবাগ থেকে সাভারের হেমায়েতপুরে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দুটি ট্যানারি এস্টেট তৈরি করা হয়। তবে, এই স্থানান্তর বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর পরিবেশের উপর কেমন প্রভাব ফেলবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। তারই প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) উক্ত গবেষণার Water Quality Index (WQI) Assessment করার জন্য NSF (National Sanitation Foundation) মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। দূগর্ন্ধ Assessment করার জন্য AERMOD মডেল ব্যবহার করে VOC, NH_3, এবং H_2S গ্যাসের বিস্তার মডেলিং করা হয়েছে। মাটি, পানি, এবং উদ্ভিদে ভারী ধাতুর ঘনত্ব পরিমাপের জন্য AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া পানির গুণগত প্যারামিটার (যেমন DO, BOD, Cr) সময়ের সাথে পরিবর্তন বিশ্লেষণের জন্য এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং এবং লিনিয়ার ট্রেন্ড মডেল ব্যবহার করা হয়েছে।

২) গবেষণায় ট্যানারী শিল্পের পাশে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা নদী, ধলেশ্বরী নদী ও সাভার হরিণধারায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট টিট্রমেন্ট প্ল্যান্ট (CETP) বর্জ্যের বিভিন্ন প্যারামিটার সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়।

ক) পানির গুণগতমানের ফলাফল:

১) **বুড়িগঙ্গা নদী:** DO মাত্রা ২.০–২.৬ mg/L,ভারী ধাতু (Cr, Pb, Zn) উপস্থিতি, জৈব দূষণ (BOD ৯–১১ mg/L)।

২) **ধলেশ্বরী নদী:** DO মাত্রা ৪.০–৬.০ mg/L (আপাতত গ্রহণযোগ্য), তবে ট্যানারি বর্জ্যের প্রভাবে ক্রমাগত অবনতি।

৩) **সাভার হরিণধারায় অবস্থিত সিএইটিপি বর্জ্য:** পরিশোধিত পানিতেও Cr-এর মাত্রা ৩.২ mg/L (আর্দশ মান ১.০ mg/L-এর চেয়ে বেশি)

খ) মাটি ও উদ্ভিদে দুষণ:

১) হাজারীবাগ: মাটিতে Cr-এর মাত্রা ১০৯–৩৮৬.৯ ppm (স্বাভাবিক মান ১০০ ppm-এর বেশি), ফসলে ক্রোমিয়ামের জৈবসঞ্চয়।

২) সাভার, হরিণধারা: ট্যানারি এলাকার মাটিতে Cr-এর মাত্রা ১৭,২২৫ ppm (অত্যন্ত বিপজ্জনক), তবে কৃষিজমিতে এখনো তুলনামূলকভাবে কম (৪৬.৭ ppm) ।

গ) **জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি:**

১) বুড়িগঙ্গা: মাছের প্রজাতি ৫৬ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৮-এ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমেছে।

২) ধলেশ্বরী: বর্তমানে ৫,৫২০ জুপ্ল্যাঙ্কটন/m^3 (স্বাস্থ্যকর), তবে মাছের প্রজাতি কমতে শুরু করেছে।

৩) গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ:

১) ট্যানারি শিল্পের দূষণ কমাতে সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট টিট্রমেন্ট প্ল্যান্ট (CETP) এর কার্যকারিতা নিশ্চিত ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা জরুরী।

২) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৩) নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করে পানির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৪) মাটি দূষণ রোধে কৃষিজমিতে ট্যানারি বর্জ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত।

৫) পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও পরিবেশ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৬) সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট টিট্রমেন্ট প্ল্যান্ট (CETP) নকশা ও নির্মাণগত ত্রুটি সমাধান করে কার্যকরী পদক্ষেপ ও বিদ্যমান পরিবেশাধন প্ল্যান্টের সমক্ষমতা মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

৭) গন্ধ নিয়ন্ত্রণে VOC, NH_3, H_2S গ্যাসের নির্গমন কমানোর জন্য স্ক্রাবার সিস্টেম স্থাপন।

৮) বায়ু দূষণ নিযন্ত্রণে AERMOD মডেলের ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ।

অর্থবছর: ২০১৮-১৯

২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ (তিনটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ যথাক্রমে যথাক্রমে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) ও Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) (২টি) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	A Study on Preparation of River Health Cards of Some Rivers of Bangladesh	BUET	৩০ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
খ)	A study on Pollution Remediation of Dhaka Hazaribagh Tannery Area	BUET	২০ লক্ষ টাকা	ঢাকা গবেষণাগার	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
গ)	Identification of Causes for degradation of Jhau Plantation and impacts of Jhau plantation to Coastal Morphological Development the Cox's Bazar	CEGIS	১০ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

ক) A Study on Preparation of River Health Cards of Some Rivers of Bangladesh:

গবেষণার লক্ষ্য:

এই গবেষণার লক্ষ্য হলো একটি সম্পূর্ণ নদী অথবা নদীর নির্দিষ্ট অংশের জন্য দূষণের মাত্রা মূল্যায়ন করা এবং একটি "নদী স্বাস্থ্য কার্ড" (River Health Card) প্রস্তুত করা।

সার-সংক্ষেপ:

বাংলাদেশ একটি বন্যাপ্রবণ দেশ, যেখানে প্রায় ৭০০টি নদী এবং উপনদী রয়েছে। এই নদীগুলোর সাথে অসংখ্য জলাভূমি এবং বিশাল প্লাবনভূমি যুক্ত। শহরাঞ্চলে শিল্প ও মানুষের বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলার কারণে অনেক নদী দূষিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) দূষণ কমাতে এবং বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষা করতে 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা' (ইসিএ) ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, টঙ্গী খাল, শীতলক্ষ্যা, হালদা এবং ময়ূর নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও অনিয়ন্ত্রিত শিল্প ও মানব বর্জ্যের কারণে বাংলাদেশের নদীগুলি মারাত্মক দূষণের সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে

টেকসই নদী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের কিছু নদীর উপর **"নদী স্বাস্থ্য কার্ড"** তৈরি করার জন্য এই গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

<u>গবেষণার ফলাফল:</u>

১) গবেষণায় ঢাকা বিভাগের ৬টি নদীর মোট ৪৪টি মনিটরিং পয়েন্টে (তুরাগ: ১০টি, বুড়িগঙ্গা: ৯টি, টঙ্গী খাল: ৬টি, বালু: ৫টি, ধলেশ্বরী: ৮টি, শীতলক্ষ্যা: ৬টি) পানি গুণগতমান পরিমাপ করা হয়েছে।

৩) গবেষণায় মোট ০৬টি নদীর মোট ৪৪টি পয়েন্টের নিম্নোক্ত প্যারামিটার সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়-

ক) ডিজলভড অক্সিজেন (DO): শুষ্ক মৌসুমে ০.১-০.৭৫ mg/L (অত্যন্ত কম), বর্ষায় ০.২৬–৩০১ mg/L (সম্ভবত টাইপো, যুক্তিসঙ্গত মান ৩.০১ mg/L হতে পারে) । স্বাস্থ্যকর নদীর জন্য DO সাধারণত ৫ mg/L এর বেশি প্রয়োজন।

খ) টার্বিডিটি (NTU): শুষ্ক মৌসুমে ১১.৩৯–১৪০ NTU, বর্ষায় ৫.৫৯–৩০৭ NTU। বর্ষায় পলি ও কঠিন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে টার্বিডিটি বেড়ে যায়।

গ) অ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেন (NH_3-N): শুষ্ক মৌসুমে ০.১–২৮ mg/L (খুব উচ্চ), বর্ষায় ০.০১–২.৮ mg/L। শিল্পবর্জ্য ও মিউনিসিপাল বর্জ্যের প্রভাব স্পষ্ট।

ঘ) ই. কোলাই (E. coli): শুষ্ক মৌসুমে ১০,০০০–১১,৯০,০০০ কাউন্ট/১০০ mL, বর্ষায় ১,০০০–১,৩৯,০০০ কাউন্ট/১০০ mL। মানববর্জ্যের সরাসরি নির্গমন নির্দেশ করে।

৩) নদীর পানির নমুনা বিশ্লেষণে শুষ্ক মৌসুম (জানুয়ারি-এপ্রিল) ও বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর) এর মধ্যে প্যারামিটারে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৪) সর্বোপরি গবেষণায় মোট ০৬টি **৬টি নদীর** -এর জন্য নদী স্বাস্থ্য কার্ড (River Health Card) তৈরি করা হয়েছে। এগুলো হলো: তুরাগ নদী, বুড়িগঙ্গা নদী, টঙ্গী খাল, বালু নদী, ধলেশ্বরী নদী, এবং শীতলক্ষ্যা নদী।

৫) গবেষণার সুপারিশসমূহ:

ক) নদী স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে নদীর ব্যবহার যোগ্যতা (সেচ, শিল্প, গৃহস্থালি), দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রণয়নে সাহায্য করবে।

খ) গবেষণায় BUET-এর গবেষক দল জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA) ও REACH প্রকল্পের ডেটা ব্যবহার করেছেন। তবে মাধ্যমিক ডেটার সীমাবদ্ধতা ও মৌসুম ভিত্তিক পরিবর্তনশীলতা এই মূল্যায়নকে জটিল করেছে।

গ) এই কার্ড বাস্তবায়ন হলে সরকারের এসডিজি ৬.৩ অর্জন ও নদী পুনরুজ্জীবনে বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি প্রণয়ন সহজতর হবে।

খ) A study on Pollution Remediation of Dhaka Hazaribagh Tannery Area;

গবেষণার লক্ষ্য:

১) হাজারীবাগ এলাকার পানি, মাটি ও বায়ুদূষণের বিষয়ে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা করা;

২) মাঠ পরিদর্শন এবং পানি (ভূগর্ভস্থ ও পৃষ্ঠতল), মাটি ও তলানি নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূষণের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করা;

৩) দূষণের মাত্রা, ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার, এবং স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক প্রযুক্তি নির্বাচন করা;

৪) প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করা;

৫) দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিংয়ের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রস্তাব করা;

৬) হাজারীবাগের মতো অন্যান্য দূষিত স্থানের জন্য একটি নির্দেশিকা বা নীতিমালা খসড়া তৈরি করা;

পটভূমি:

হাজারীবাগ, ঢাকা শহরের একটি ঐতিহাসিক শিল্পাঞ্চল, যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পরিচালিত হয়ে এসেছে। প্রায় ১৮৬টি ট্যানারি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ প্রায় ৭০ একর জায়গার মধ্যে গড়ে ওঠে। এই শিল্পকারখানাগুলো থেকে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ আশেপাশের পরিবেশে মারাত্মক দূষণের সৃষ্টি করত। ট্যানারিগুলো থেকে নির্গত তরল বর্জ্য সরাসরি ড্রেনের মাধ্যমে স্থানীয় ল্যাগুন ও পরে বুড়িগঙ্গা নদীতে নিষ্কাশন হতো। কঠিন বর্জ্যগুলোও এলাকা ও আশপাশের নিচু জমি, ড্রেন এবং নালায় ফেলে দেওয়া হতো। এর ফলে পানি, মাটি ও নদীর তলানিতে ভারী ধাতু ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিপজ্জনক মাত্রায় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) এলাকা পরিষ্কার এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়।

গবেষণার ফলাফল:

গবেষণায় হাজারীবাগ এলাকার Groundwater ও Wastewater, মাটি ও গাদা (Soil & Sediment), Leaching Test (TCLP) এর নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মোট ২৭০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৫টি পানির নমুনা এবং ১৩৫টি বায়ুর নমুনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিম্নে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো উপস্থাপন করা হলো-

১) পরিবেশগত দূষণ: হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারিগুলো থেকে নির্গত কঠিন ও তরল বর্জ্য এবং বায়ুদূষণ স্থানীয় পরিবেশের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে আশপাশের পানি ও মাটি ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, হাজারীবাগ ট্যানারি এলাকার মাটি ও নদীর পলিতে বিপজ্জনক মাত্রায় ভারী ধাতু-যেমন ক্রোমিয়াম (Cr), ক্যাডমিয়াম (Cd), সীসা (Pb) প্রভৃতি-সংগৃহীত হয়েছে। এর

মধ্যে ক্রোমিয়ামের মাত্রা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক, যা প্রাকৃতিক মাটির তুলনায় বহুগুণ বেশি পাওয়া গেছে; সর্বোচ্চ পরিমাপ ছিল ৪০,৮৭৮ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি (mg/kg)।

২) স্বাস্থ্যগত প্রভাব: হাজারীবাগ এলাকায় ট্যানারি বর্জ্যের প্রভাবে স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিশেষত, শ্বাসকষ্ট, ত্বকের রোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি জটিল রোগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশগত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যদিও ভূগর্ভস্থ পানিতে ভারী ধাতুর মাত্রা বাংলাদেশের নিরাপদ পানীয় জলের মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে, তবে পৃষ্ঠতলের জল—যেমন ড্রেনেজ ক্যানাল ও ল্যাগুনের পানি-উচ্চ মাত্রায় জৈব দূষক ও পুষ্টি উপাদান (nutrients) বহন করছে। এসব উপাদান জলজ পরিবেশে অতিরিক্ত ইউট্রোফিকেশন সৃষ্টি করতে পারে, যা পানির গুণগতমান ও বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৩) **পানি দূষণ:** বুড়িগঙ্গা নদীতে হাজারীবাগ ট্যানারিগুলো থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলার ফলে নদীর পানির গুণমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই গবেষণায় সংগৃহীত বর্জ্য পানির নমুনায় তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রায় color, turbidity, TSS, অ্যামোনিয়া, ফসফেট, সালফেট, COD, এবং BOD পাওয়া গেছে। এসব মান ইঙ্গিত করে যে পানি মারাত্মকভাবে দূষিত এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এছাড়া, ড্রেনেজ খালের নিকটবর্তী এলাকা থেকে সংগৃহীত অধিকাংশ মাটি নমুনায় ক্রোমিয়াম (Cr), ক্যাডমিয়াম (Cd), সীসা (Pb) এবং দ্রবীভূত লবণের (soluble salts) উচ্চ ঘনত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে, যা মাটির গঠন ও কৃষিজ উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৪) **বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা**: ট্যানারিগুলোতে যথাযথ বর্জ্য শোধনাগার না থাকায় পরিবেশ দূষণের মাত্রা বেড়েছে। সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (CETP) এর বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা দেখা গেছে।

৫) **গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:**

ক) **দূষিত মাটি ও পলি অপসারণ**: লেগুন, ড্রেনেজ ক্যানাল ও বুড়িগঙ্গা অ্যাপ্রোচ ক্যানালের দূষিত মাটি খনন করে ল্যান্ডফিলে করার সুপারিশ।

খ) **পরিকল্পিত পুনর্বাসন**: RAJUK-এর মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী এলাকাটিকে আবাসিক ও বিনোদনমূলক জোনে রূপান্তরের সুপারিশ।

গ) **দীর্ঘমেয়াদি মনিটরিং**: ভূগর্ভস্থ পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং দূষণকারী শিল্প স্থানান্তরের সুপারিশ।

গ) (Identification of Causes for degradation of Jhau Plantation and impacts of Jhau plantation to Coastal Morphological Development the Cox's Bazar)

গবেষণার লক্ষ্য:

১) এই গবেষণার লক্ষ্য হলো ঝাউ গাছের অবক্ষয় ও বন উজাড়ের কারণ চিহ্নিত করা ।

২) সাম্প্রতিক সময়ে ঝাউ গাছের মৃত্যুর পেছনে দায়ী কারণগুলো (যেমন: জলাবদ্ধতা, রোগ-বালাই, প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট চাপ) অনুসন্ধান করা।

৩) ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু (২০১৬) ও মোরা (২০১৭)-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝাউ বনায়নের ওপর প্রভাব মূল্যায়ন করা।

৪) ঝাউ গাছের মাধ্যমে উপকূলীয় বালু স্থিতিশীলকরণ, ক্ষয়রোধ ও ভূমিরূপ গঠনে এর ভূমিকা নিরূপণ করা।

৫) জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ঝাউ গাছের কার্বন সংরক্ষণ ক্ষমতা মূল্যায়ন করা।

৬) উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ঝাউ বনায়নের প্রতি সমর্থন, ব্যবহার ও উপলব্ধ সুবিধা বিশ্লেষণ করা।

৭) স্থানীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা।

৮) ঝাউ বনায়নের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরামর্শ প্রদান করা।

৯) দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু অভিযোজন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করা।

পটভূমি:

গবেষণাটি পরিচালনার মূল কারণ ছিল বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে, বিশেষত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ঝাউ গাছের ব্যাপক মৃত্যু ও অবনতির কারণ অনুসন্ধান করা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ৪৫২টি জাউ গাছের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু ও মোরার প্রভাবে ক্ষয়িষ্ণুতা, এবং জলাবদ্ধতা বা রোগের মতো সম্ভাব্য পরিবেশগত সমস্যাগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে এই গবেষণা প্রয়োজন হয়েছিল। এছাড়া, ঝাউ বনায়নের মাধ্যমে গঠিত "গ্রিন বেল্ট" কীভাবে উপকূলীয় ভূমিরূপ স্থিতিশীল করে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে সুরক্ষা দেয়, এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্বন সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে-তা মূল্যায়ন করাও গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল। সরকারি বিনিয়োগের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ জোরদার করা, এবং জলবায়ু সহনশীলতা বাড়ানোই এই গবেষণার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) উপকূলীয় ক্ষয়, জলাবদ্ধতা ও অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে ঝাউ বনায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লাবণী সৈকতে নিষ্কাশন পথ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতার কারণে ঝাউ গাছের ব্যাপক মৃত্যু ঘটে।

২) গবেষণায় দেখা গেছে, ঝাউ গাছ উপকূলীয় ক্ষয় রোধ বা বালিয়াড়ি গঠনে সরাসরি ভূমিকা রাখে না। বরং, এর স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপকূলের ভূমিরূপ গতিশীলতার উপর (যেমন পলি সরবরাহ, তরঙ্গের দিক)।

৩) ঝাউ গাছ উপকূলীয় ভূ-প্রকৃতির গতিশীলতার (সেডিমেন্ট সরবরাহ, ঢেউয়ের দিক) উপর নির্ভরশীল, ক্ষয়রোধে সরাসরি ভূমিকা নেই। ভবিষ্যতে ঝাউ বনায়নের জন্য সেডিমেন্টের পর্যাপ্ত উৎস সমৃদ্ধ স্থান নির্বাচন জরুরি, অন্যথায় ক্ষয় বাড়বে। নদী/খালের মোহনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে বনায়ন করতে হবে, কারণ মোহনার প্রসারণ ঝাউয়ের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। সামুদ্রিক কাছিমের প্রজননক্ষেত্র (সংকীর্ণ ও মৃদু ঢালযুক্ত সৈকত) ঝাউ বনায়ন থেকে মুক্ত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

৪) অধিকাংশ ঝাউ বনাঞ্চল শারীরিকভাবে সুস্থ আছে, তবে কিছু ক্ষুদ্র অসুস্থ প্যাচ দেখা গেছে। মৃত্তিকা ও গাছের দেহাবশেষের সীমিত রাসায়নিক বিশ্লেষণে অবনতির স্পষ্ট কারণ শনাক্ত করা যায়নি।

৫) কক্সবাজার-টেকনাফ সৈকতের লাল চিহ্নিত অঞ্চল (সেডিমেন্ট ঘাটতিযুক্ত) ঝাউ বনায়নের জন্য অনুপযুক্ত। ঝাউয়ের অবনতির কারণ বুঝতে মাটি, গাছের রোগবালাই ও ভৌত-রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় ঝাউ বনায়নের পাশাপাশি স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির গতিশীলতা বিবেচনা করা আবশ্যক।

৬) **গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ:**

ক) ঝাউ রোপণের জন্য এমন স্থান বেছে নেওয়া উচিত যেখানে পর্যাপ্ত পলির উৎস আছে। পলি সরবরাহ না থাকলে উপকূলীয় ক্ষয় বাড়বে।

খ) নদী বা খালের মোহনা ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলে ঝাউ বনায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই মোহনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে বনায়ন করা জরুরি।

গ) অত্যন্ত মৃদু ঢাল ও সংকীর্ণ সৈকত, যেখানে সামুদ্রিক কাছিম ডিম পাড়ে, সেসব এলাকা ঝাউ রোপণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

ঘ) উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে কক্সবাজার-টেকনাফ সৈকতের ক্ষয়প্রবণ এলাকা (লাল চিহ্নিত) এড়িয়ে চলতে হবে। এসব স্থানে পলি সরবরাহ কম বলে উপকূল রেখা স্থলভাগের দিকে সরে যাচ্ছে।

অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ২২ (বাইশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ (একটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমটির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	A Study on Development of Model Based Guidelines for Permitting Brick Kilns	BUET	২২ লক্ষ টাকা	বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি জুন/২০২১ প্রকাশিত হয়েছে।	

গবেষণার লক্ষ্য:

গবেষণার লক্ষ্যগুলো নিম্নরুপ :

১. বাংলাদেশে ইটভাটা স্থাপনের জন্য মডেল-ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক নির্দেশিকা প্রণয়ন;

২. ইটভাটার প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি ইটভাটা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা;

৩. বিভিন্ন প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট এলাকায় অনুমোদনযোগ্য ইটভাটার সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য ওই এলাকার পরিবেশগত ধারণক্ষমতা (carrying capacity) মূল্যায়ন করা;

পটভূমি:

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের বায়ুদূষণ, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলোতে, এর স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। যদিও বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোর বায়ুদূষণ কমাতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, জাতীয় বায়ুদূষণ মান পূরণের জন্য আগামী বছরগুলোতে আরও বেশি প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে। কণা পদার্থ, কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের মতো প্রধান বায়ু দূষণকারীগুলো মূলত বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইটভাটা, যানবাহন, ইস্পাত কারখানা এবং অন্যান্য শিল্পে জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের কারণে তৈরি হয়। ইটভাটা বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস, এবং বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাব রয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে, দেশে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নতুন ইটভাটা স্থাপনের অনুমতির জন্য একটি নীতিমালার (গাইডলাইন) প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

১. AERMOD (American Meteorological Society/Environmental Protection Agency Regulatory Model) নামক সফটওয়্যারের মাধ্যমে বায়ুদূষণের ছড়ানোর (dispersion) মডেলিং করা হয়েছে;

২. বিভিন্ন প্রযুক্তির ইটভাটার জন্য জমির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়েছে;

৩. বিভিন্ন প্রযুক্তির ইটভাটা একত্রে স্থাপন করলে দূষণের মাত্রা কেমন হয়,তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে;

৪. দূষণের প্রভাব এলাকা (impact zone) চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে অনুমোদনের সময় ব্যবহার করা যায়;

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে মূল সুপারিশসমূহ নিম্নরুপ:

১. FCK (Fixed Chimney Kiln) ধরণের ইটভাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখা উচিত এটি সবচেয়ে বেশি দূষণকারী;

২.Traditional Zigzag Kilns (TZK): এক কিমির মধ্যে একাধিক TZK স্থাপন না করার সুপারিশ;

৩.Improved Zigzag Kilns (IZK): ৬০০ মিটারের ব্যবধানে স্থাপন করা যেতে পারে;

৪. Hybrid Hoffman Kilns (HHK): ক্লাস্টার না করে পৃথকভাবে স্থাপন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

৫. Tunnel Kiln (TK) ও Vertical Shaft Kiln উচ্চ উৎপাদনক্ষমতা ও কম দূষণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী;

৬. "Airshed" অঞ্চলে নতুন ইটভাটা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থবছর: ২০২০-২০২১

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৬৭ (সাতষট্টি) লক্ষ টাকা (পূর্বের অর্থবছরের অব্যবহৃত অর্থ সমন্বয় করে) ব্যয়ে ৩ (তিনটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ যথাক্রমে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) (২টি) ও Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) কর্তৃক সম্পাদিত হয়। তবে (CEGIS) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন অদ্যাবধি দাখিল করা হয়নি। নিম্নে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	A study on Baseline Development of SDG Indicators: 6.6.1 and 15.1.2	CEGIS	৮ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
খ)	A Study on Damage Assessment for Environmental Compensation.	BUET	২০ লক্ষ টাকা	মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
গ)	A study to Delineate of ECAs Boundary for all ECAs of Cox's Bazar District	CEGIS	৩৯ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	**চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি।**	

ক) A study on Baseline Development of SDG Indicators: 6.6.1 and 15.1.2:

গবেষণার লক্ষ্য:

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) নির্দেশক ৬.৬.১ এবং ১৫.১.২ এর জন্য ভিত্তিমূলক ডেটা তৈরি এবং বিশ্লেষণ প্রদান করা।

১. SDG নির্দেশক ৬.৬.১: সময়ের সাথে সাথে পানি-সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্রে পরিবর্তনের পরিমাণ নিরূপণ;

২. SDG নির্দেশক ১৫.১.২: বাস্তুতন্ত্রের ধরন অনুযায়ী সুরক্ষিত অঞ্চল দ্বারা আবৃত স্থলজ ও স্বাদুপানির জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ সাইটসমূহের অনুপাত নিরূপণ;

পটভূমি:

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs) ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, যা ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখা এবং সকল মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য একটি সার্বজনীন আহবান। SDGs-এ ১৭টি লক্ষ্য রয়েছে, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের ১৬৯টি নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে । এছাড়াও, এই লক্ষ্যগুলির অগ্রগতি ২৩২টি অনন্য সূচকের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি উন্নয়ন লক্ষ্য নির্দিষ্ট কিছু সূচকের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।

লক্ষ্যগুলোর মধ্যে, এসডিজি ৬ - নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন, যা টার্গেট ৬.৬-এ "পর্বত, বন, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং হ্রদসহ জলসম্পর্কিত প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার" করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬.৬.১ সূচকের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই সূচকটি এই প্রতিবেশ ব্যবস্থাগুলি কীভাবে এবং কেন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে তা বোঝার ওপর গুরুত্ব দেয়। ৬.৬.১ সূচকের বিভিন্ন উপাদান জলসম্পর্কিত প্রতিবেশ ব্যবস্থার সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি সামগ্রিক চিত্র প্রদান করে।

এছাড়াও, এসডিজি সূচক ১৫.১.২ পরিমাপ করে "স্থলভাগ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর অনুপাত যা সুরক্ষিত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, প্রতিবেশ প্রকার অনুযায়ী", যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের লক্ষ্য ১৫.১ এর প্রতি অগ্রগতি চিহ্নিত করে। এই সূচকটি বন, জলাভূমি, পর্বত এবং শুষ্ক ভূমি সহ স্থল ও মিঠা পানির প্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং টেকসই ব্যবহারের অগ্রগতির একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

তবে, উল্লিখিত সূচকগুলো সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে ডেটার অভাব ২০১৭ সালের পাইলট পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এজন্য স্যাটেলাইট চিত্র থেকে জাতীয় ডেটা এবং ডেটা সংগ্রহের একটি সমন্বিত পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্য পূরণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজন মেটাতে, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ৬.৬.১ এবং ১৫.১.২ নম্বর সূচকের জন্য বেসলাইন তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা এবং ২০২০, ২০২৫ ও ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার একটি পূর্বাভাস প্রদান করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

SDG সূচক ৬.৬.১-এর প্রধান ফলাফল:

১) স্থায়ী ও মৌসুমি জলাধারের পরিমাণ: ২০২০ সালে স্থায়ী জলাধারের পরিমাণ ১,৫৫৭.৭২ বর্গকিমি এবং মৌসুমি জলাশয়ের পরিমাণ ১৭,১৪২.৯ বর্গকিমি।

২) জলাধারের প্রবণতা: ২০০০-২০১৭ পর্যন্ত স্থায়ী জলাধার হ্রাস পেয়েছে, তবে ২০১৭-২০২০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌসুমি জলাধার ২০০৯ সালে সর্বোচ্চ ছিল।

৩) জলাধারের পরিমাণ: ২০০০-২০২০ সালে জলাধারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন জলাশয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪) আর্দ্রভূমি: বাংলাদেশের মোট আর্দ্রভূমির পরিমাণ ৮০,৬৭৯.৫৯ বর্গকিমি (মোট ভূমির ৬০%) ।

৫) ম্যানগ্রোভ বন: ১৯৯৬-২০১৬ সালে ম্যানগ্রোভের পরিমাণ ৪,০৯৯ বর্গকিমি থেকে ৪,০৪৬.১৮ বর্গকিমিতে হ্রাস পেয়েছে।

৬) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর: ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সবচেয়ে বেশি নেমে গেছে।

SDG সূচক ১৫.১.২-এর প্রধান ফলাফল:

১) জীববৈচিত্র্য অঞ্চল (KBAs): বাংলাদেশে ২০টি KBA রয়েছে, যার মোট আয়তন ১৩, ১৫,০২৯ হেক্টর।

২) সংরক্ষিত অঞ্চল (PAs): ৫১টি সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে ৪৮টি জাতীয় এবং ৩টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

৩) KBA ও PA-এর আচ্ছাদন: ২০টি KBA-এর মধ্যে ১২টি PA দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। গড় আচ্ছাদন ৪৫.৬০%।

৪) ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ECA): ৬টি KBA ECA দ্বারা আচ্ছাদিত, গড় আচ্ছাদন ২১.২৭%।

খ) A Study on Damage Assessment for Environmental Compensation:

গবেষণার লক্ষ্য:

- পরিবেশের ক্ষতিসাধনের কারণে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি কার্যকর নির্দেশনার খসড়া তৈরি করা এবং সেই অনুযায়ী পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা;
- বায়ু ও পানি দূষণের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ;
- পরিবেশগত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করা;

পটভূমি:

মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, যেমন - আবাসিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন, জ্বালানি পরিকাঠামো, খনি, রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ, ড্রেজিং, সেইসাথে কৃষি, বন, মৎস্য ইত্যাদি সহ বিভিন্ন কারণে পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে উন্নত পরিকল্পনা কাঠামো থাকা সত্ত্বেও, সময়ের সাথে সাথে পরিবেশের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। যেহেতু অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পেরই কিছু নেতিবাচক প্রভাব থেকে যায় এবং কোনো পরিবেশগত ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হয় না, তাই সমাজ ধীরে ধীরে প্রকৃতি থেকে পাওয়া মূল্যবান সুবিধাগুলো হারাচ্ছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা, যেগুলোকে "প্রাকৃতিক মূলধন" হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই প্রভাব মোকাবিলা করার একটি উপায় হলো পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার দাবি জানানো, যা ক্ষতিগ্রস্ত বা

দুষ্প্রাপ্য সম্পদ রক্ষা, বৃদ্ধি, পুনরুদ্ধার বা অন্যভাবে উন্নত করে। তারই প্রেক্ষিতে, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে এই গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

এই গবেষণায় পরিবেশগত দূষণের ক্ষতি মূল্যায়নের জন্য ৩টি সূত্র ও ৪টি মডেল ব্যবহার করা হয়েছে । **নিচে এগুলোর বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো:**

সূত্র: (Equations)

১. বায়ু দূষণের ক্ষতি মূল্যায়ন: বায়ু দূষণের ক্ষতিপূরণ পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

ক) Value of Statistical Life (VSL): মৃত্যুঝুঁকির অর্থনৈতিক মূল্য (উদা: ১ জনের মৃত্যুর ক্ষতি ≠ ৫০ লক্ষ টাকা।

খ) Cost of Illness (COI): রোগের চিকিৎসা ও উৎপাদনশীলতা হারানোর খরচ।

গ) সূত্র:

$$\text{PAR} = \frac{(\text{Rr}© - 1) \times \text{p}©}{(Rr(c) - 1) \times p(c) + 1}$$

যেখানে $R_I(C) = 1 + (C_a - C_w(R_r - 1)/10$ (দূষণের ঘনত্ব ও স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্পর্ক)।

২. পানি দূষণের ক্ষতি মূল্যায়ন:

পানি দূষণ নির্ধারণের জন্য **জিরো-ডাইমেনশনাল ডাইলিউশন মডেল** প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে:

$$C_0 = \frac{(C_S \times Q_S + C_B \times Q_B)}{(Q_S + Q_B)}$$

যেখানে.

C_0: মিশ্রণের পর দূষকের চূড়ান্ত ঘনত্ব (mg/L)

Cs: বর্জ্য পানি দূষকের ঘনত্ব

Q_S: বর্জ্য পানি প্রবাহ হার (m´/s)

C_B: জলাধারের প্রাথমিক দূষক ঘনত্ব

Q_B: জলাধারের প্রাকৃতিক প্রবাহ হার

৩. **স্বাস্থ্য ক্ষতির মূল্যায়ন:** স্বাস্থ্য ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য Dose-Response মডেল সুপারিশ করা হয়েছে;

স্বাস্থ্য ক্ষতি=Dose-Response ফ্যাক্টর×দূষকের অতিরিক্ত ঘনত্ব×জনসংখ্যাস্বাস্থ্য ক্ষতি=Dose-Response ফ্যাক্টর×দূষকের অতিরিক্ত ঘনত্ব×জনসংখ্যা (উদাহরণ: আর্সেনিকের জন্য ক্যান্সার ঝুঁকির ফ্যাক্টর ব্যবহার।)

Cost of Illness (COI):

মোট খরচ=চিকিৎসা খরচ+উৎপাদনশীলতা হারানোর মানমোট খরচ=চিকিৎসা খরচ+উৎপাদনশীল তা হারানোর মান

মডেল (Models):

নং	মডেল (Models):
১.	**Control Cost Method:** ব্যবহার: জলাধার পুনরুদ্ধারের আনুমানিক ব্যয় গণনা।
২.	**Willingness to Pay (WTP):** ব্যবহার: দূষণের কারণে বিনোদন বা সম্পদের মূল্য হ্রাসের পরিমাপ।
৩.	**Disability-Adjusted Life Years (DALY):** ব্যবহার: দূষণজনিত রোগে আক্রান্ত জীবনের বছর হিসাবে ক্ষতি।
৪.	**Preventive Expenditure Model***:* ব্যবহার*:* দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি (ETP) স্থাপনের খরচ বিশ্লেষণ।

গ) A study to Delineate of ECAs Boundary for all ECAs of Cox's Bazar District:

<u>গবেষণার লক্ষ্য:</u>

গবেষণার লক্ষ্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) কক্সবাজার-টেকনাফ উপদ্বীপ ইসিএ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ইসিএ এবং সোনাদিয়া দ্বীপ প্রতিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকার (ইসিএ) সীমানা নির্ধারণ করা।

২) জিআইএস (GIS) প্ল্যাটফর্মে চূড়ান্ত মৌজা প্লট ডেটাবেসের সাথে বিদ্যমান ইসিএ সীমানাটির একটি আচ্ছাদন তৈরি করা।

৩) ইসিএ সীমানার অধীনে জেএল নম্বর, দাগ নম্বর, সম্পূর্ণ প্লট বা আংশিক প্লটের স্থিতি, প্লটের অঞ্চল ইত্যাদি উল্লেখ করে মৌজা প্লট সূচক প্রস্তুত করা।

৪) ইসিএ সীমানা, প্লটের সীমানা, প্লট নম্বর, জেএল নম্বর, মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার নাম সম্বলিত মৌজাভিত্তিক শীট তৈরি করা।

পটভূমি:

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৯ সালে কক্সবাজার-টেকনাফ উপদ্বীপ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এবং সোনাদিয়া দ্বীপকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area - ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই এলাকাগুলোর বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য অনন্য এবং এদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন । তবে, ঘোষণা পত্রে এই এলাকাগুলোর সীমানা মৌজা এবং প্লট নম্বর দিয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি, যা ২০১৬ সালের ইসিএ ব্যবস্থাপনা বিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছিল । এই কারণে, পরিবেশ অধিদপ্তর এই এলাকাগুলোর সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণের জন্য এই গবেষণা কার্যক্রমটি গ্রহণ করে।

গবেষণার ফলাফল:

অদ্যাবধি গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি।

অর্থবছর: ২০২১-২০২২

ক্রম	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য
২০২১-২০২২ অর্থবছরে করোনা মহামারীর কারণে নতুন কোন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা হয়নি।					

অর্থবছর: ২০২২-২৩

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ৩ (তিনটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ যথাক্রমে Waste Concern, Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) ও Jahangirnagar University নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হয়। অদ্যাবধি ১টি গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Assessment of Methane Emission from Matuail and Amin Bazar Landfill site and Options for Mitigation	Waste Concern	১১ লক্ষ টাকা	জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি।	
খ)	Water Monitoring Software Upgradation	CEGIS	৬.৬ লক্ষ টাকা	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা	গবেষণার কাজ চলমান। Inception প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
গ)	Air Quality Monitoring system (Real Time Air Quality Monitoring System & Health Alarming System)	(IIT) Jahangirnagar University	১৭ লক্ষ টাকা	বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখা	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ুর গুণগত মানের পূর্বাভাস ব্যবস্থা সাবক্ষর্ণিক চালু রাখা হয়েছে।	

ক) Assessment of Methane Emission from Matuail and Amin Bazar Landfill site and Options for Mitigation:

গবেষণার লক্ষ্য:

- ঢাকা শহরের মাতুয়াইল ও আমিনবাজার ল্যান্ডফিল এবং এর চতুর্দিকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বর্জ্য থেকে নির্গত মিথেন গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করা;
- মিথেন গ্যাস নিঃসরণ কমাতে বিভিন্ন কৌশল মূল্যায়ন করা;
- ঢাকা শহরের ল্যান্ডফিল গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাই করা;
- ল্যান্ডফিল মিথেন গ্যাস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি টেকসই কাঠামো তৈরি করা;

পটভূমি:

ঢাকা শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুতর ও ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মূলত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)-এর ওপর ন্যস্ত। ডিএসসিসির আয়তন ১০৯.২৫ বর্গকিলোমিটার, যেখানে ৭৫টি ওয়ার্ডে আনুমানিক ৪৩,০৫,০৬৩ জন মানুষ বসবাস করেন। অপরদিকে, ডিএনসিসির আয়তন ১৯৬.২২ বর্গকিলোমিটার এবং এর ৫৫টি ওয়ার্ডে জনসংখ্যা প্রায় ৫৯,৯০,৭২৩ জন। ফলে, সমগ্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১,০২,৯৫,৭৮৬ জন।

প্রতিদিন ডিএনসিসি গড়ে ৩৪৮৩ টন এবং ডিএসসিসি ২৫০০ টন বর্জ্য সংগ্রহ করে থাকে। এসব বর্জ্যের একটি বড় অংশ, প্রায় ৭৩%, সরাসরি ল্যান্ডফিল সাইটে ফেলা হয়। ক্রমবর্ধমান বর্জ্য উৎপাদন ও সীমিত ধারণক্ষমতার কারণে উল্লিখিত ল্যান্ডফিল দুটি বর্তমানে প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

এপ্রেক্ষিতে, ঢাকা শহরের মাতুয়াইল ও আমিনবাজার ল্যান্ডফিল এবং এর আশেপাশের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বর্জ্য থেকে নির্গত মিথেন গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ, উক্ত গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই, এবং ল্যান্ডফিল মিথেন গ্যাস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি টেকসই কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে এই গবেষণা কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

গবেষণালয় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরুপ:

১. **বর্জ্যের সংমিশ্রণ**:

ক) আমিনবাজার ল্যান্ডফিল:

জৈব বর্জ্য (৬৪.২১%): প্রধানত খাদ্যবর্জ্য (Food & Vegetable Waste), হাড় (Bone) ইত্যাদি।

প্লাস্টিক (১৬.৪৯%): LDPE (পলিথিন), HDPE, PET, PVC প্রভৃতি।

অন্যান্য: টেক্সটাইল (৮.৮%), কাগজ (২.৯৫%), ডায়াপার (৩.০৬%), কাঁচ (০.৭৩%)।

খ)মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল:

জৈব বর্জ্য (৮৫%): অধিকাংশই খাদ্যবর্জ্য।

প্লাস্টিক ও অন্যান্য: তুলনামূলকভাবে কম (মাধ্যমিক তথ্যের ভিত্তিতে)।

২. **মিথেন নির্গমন**:

আমিন বাজার ল্যান্ডফিল:

ক) FODM (**First Order Decay Model**) মডেল: **৩.০৩ টন/ঘণ্টা।**

খ) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থাম্ব রুল: ৬.৫১ টন/ঘণ্টা (উচ্চতর অনুমান)।

মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল:

ক) FODM (First Order Decay Model) অনুযায়ী ২.৫৪ টন/ঘন্টা

খ) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ব্যাংক পদ্ধতিতে ৫.০৭ টন/ঘণ্টা।

৩. **বায়ুর গুণমান**:

ল্যান্ডফিলের আশেপাশের এলাকায় SO_2, CO, NO_2, PM2.5, এবং PM10 এর মাত্রা বাংলাদেশ ও WHO-এর মানমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে PM2.5 এবং PM10 এর মাত্রা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৪. **প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ:**

১. ল্যান্ডফিল গ্যাস থেকে মিথেন সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের প্রস্তাব;

২. মিথেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে গ্যাস ইঞ্জিন বা টারবাইন চালানো;

৩. জৈব ও প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও কম্পোস্টিং-এর মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাসের পরিকল্পনা;

৪. পরিবেশ দূষণ রোধে গ্রিন বেল্ট, বায়ু ফিল্টার ও ল্যান্ডফিল কভার ব্যবহারের সুপারিশ;

৫. সুশাসনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়, স্যাটেলাইট মনিটরিং ও PPP মডেলকে গুরুত্ব দেওয়া; হয়েছে;

৬. গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে মিথেন নির্গমন মডেল ও পরিবেশগত প্রভাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা প্রস্তাব;

খ) Water Monitoring Software Up gradation

<u>গবেষণার লক্ষ্য:</u>

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত ওয়েব ভিত্তিক Water Quality Monitoring Sytem (WQMS) সফটওয়্যার আপডেট করা । এর মাধ্যমে পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও ব্যবহারকারীবান্ধব করা হবে।

<u>গবেষণার ফলাফল:</u>

গবেষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ) Air Quality monitoring system (Real Time Air Quality Monitoring System & Health Alarming System)

গবেষলণার লক্ষ্য:

১.পুরাতন ম্যানুয়াল পদ্ধতির স্থলে স্বয়ংক্রিয় একিউআই (AQI) সিস্টেম চালু করে প্রতি ঘণ্টায় বায়ুর মান হালনাগাদ প্রকাশ;

২. "সিভিয়ার" দূষণে স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্টের মাধ্যমে জনসচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা;

৩. ১৬টি সিএএমএসের নেটওয়ার্কে ১৫টি নতুন স্টেশন যুক্ত করে মোবাইল অ্যাপ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু;

৪. স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণে ম্যানুয়াল শ্রম ৭৫% কমানো ও কার্যক্রমের গতি-নির্ভুলতা বৃদ্ধি।

পটভূমি:

দেশের বায়ুদূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসসহ নানা ধরনের শ্বাসতন্ত্রের রোগ বাড়ছে। ধূলিকণা ও বিষাক্ত গ্যাসের কারণে শিশু ও বয়স্কদের স্বাস্থ্যঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও নির্মাণকাজের ধুলাবালি বাতাসে $PM_{2.5}$ এর মাত্রা অতিক্রম করে, যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণ হতে পারে। বায়ু দূষণের ফলে চোখে জ্বালা-পোড়া, মাথাব্যথা ও ক্লান্তি বেড়েছে, যা কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। দীর্ঘমেয়াদে এই দূষণ নগরবাসীর গড় আয়ু হ্রাস ও পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্টের কারণ হচ্ছে। তারই প্রেক্ষিতে এই গবেষণাটি কাজটি দেশের রিয়েল-টাইমে বায়ু দূষণের মাত্রা পরিমাপ এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফল:

১) বাংলাদেশে বায়ুরগুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও স্বাস্থ্য সতর্কতা পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে এই গবেষণা Continuous Air Quality Monitoring System (CAMS)-এর বিস্তারিত তথ্য প্রস্তুত করেছে।

২) দেশের ১৬টি স্থানে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেটসহ) CAMS স্টেশন স্থাপন করে PM2.5, PM10, SO_2, NOx, CO, O_3 এর মতো বায়ুদূষণকারী পদার্থ এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত ডেটা (বাতাসের গতি, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা) রিয়েল-টাইমে সংগ্রহ করা হয়।

৩) আগের পদ্ধতিতে ডেটা ম্যানুয়ালি আপলোড করা হতো, যা এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতি ঘণ্টায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট হয়।

৪) বায়ুর মান "সিভিয়ার" পর্যায়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ট জারি করা হয়।

৫) Java, React.js, Google Map, Oracle/SQL-এর মতো টুল ব্যবহার করে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও ডিজিটাল ডিসপ্লে তৈরি করা হয়েছে।

৬) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের বায়ুর গুণগত মানের পূর্বাভাস ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে নিয়মিত ফলাফল সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে মোট ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ (চারটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিম্নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য	কিউআর কোড
ক)	Study of the SDG Indicator 12.4.2. (a): Hazardous Waste Generated Per Capita and 12.4.2(b): Proportion of Hazardous Waste Treated by Type of Treatment.	CEGIS	১৮ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
খ)	Study of the SDG Indicator 9.4.1: CO_2 Emission Per Unit of Value Added.	CEGIS	১২ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
গ)	Study of the SDG Indicator 14.2.1: Number of Countries using Ecosystems- based Approaches to Managing Marine Areas.	CEGIS	১০ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	
ঘ)	Study of the SDG Indicator 14.1.1(a): Index of Coastal Eutrophication.	CEGIS	১০ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা শাখা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	

ক) Study of the SDG Indicator 12.4.2. (a): Hazardous Waste Generated Per Capita and 12.4.2(b): Proportion of Hazardous Waste Treated by Type of Treatment.:

গবেষণার লক্ষ্য:

প্রধান লক্ষ্য হলো SDG 12.4.2(a) এবং 12.4.2(b) সূচকের জন্য ভিত্তি তথ্য তৈরি করা এবং ২০২৫ ও ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।

বিশেষ লক্ষ্যগুলো হলো:

১) মাথাপিছু এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে উৎপন্ন বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা;

২) বিপজ্জনক বর্জ্যের ধরন (বিশেষ করে ই-ওয়েস্ট) অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ;

৩) কী পরিমাণ বর্জ্য পরিবেশবান্ধবভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ;

৪) উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ অনুযায়ী বর্জ্য-তীব্রতা বিশ্লেষণ;

৫) ২০২৫ ও ২০৩০ সালের জন্য অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রার পূর্বাভাস প্রদান;

পটভূমি:

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs) ২০১৫ সালে সকল সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত একটি বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সকল মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষা করে। ১৭টি লক্ষ্যকে ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট টার্গেট এবং ২৩২টি সূচকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। এসডিজির ৬ নং লক্ষ্য "টেকসই উৎপাদন ও ভোগ" (Responsible Consumption and Production) এর অধীনে টার্গেট ১২.৪-এ রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই টার্গেটের উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোকে রাসায়নিক ও বর্জ্যের জীবনচক্রে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং বায়ু, পানি ও মাটিতে এর ক্ষতিকর নিঃসরণ কমিয়ে মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব হ্রাস করা। সূচক ১২.৪.২-এর মাধ্যমে (ক) প্রতি ব্যক্তির বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদন এবং (খ) চিকিৎসার ধরন অনুযায়ী বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার হার পরিমাপ করা হয়। সর্বোপরি SDG 12.4.2(a) ও 12.4.2(b) সূচকের জন্য বেসলাইন তথ্য ও পূর্বাভাস প্রস্তুতের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিবেশ অধিদপ্তর এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

গবেষণার ফলাফল:

গবেষণায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর পৌরসভা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরিপ, ২০২২ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মেটাডেটা (UNSTAT, UNEP) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারি নীতি ও অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ২০২৫ ও ২০৩০ সালের জন্য টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নিম্নরুপ-

১) ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদন ছিল ২৭.২৫ কেজি।

২) মাত্র ০.২৬% বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবেশবান্ধবভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩) ই-ওয়েস্টের ক্ষেত্রে সংগৃহীত এবং উৎপাদিত পরিমাণ সমান অর্থাৎ ১০০% সংগ্রহের হার।

৪) প্রধানত 'Chemical Method' ও 'Physical Method'-এর মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্পত্তি হয়েছে।

৫) তাপীয় (Thermal) বা জীববৈজ্ঞানিক (Biological) পদ্ধতিতে কোন নিষ্পত্তি হয়নি।

খ) Study of the SDG Indicator 9.4.1: CO_2 Emission Per Unit of Value Added.

গবেষণার লক্ষ্য:

এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো:

১) SDG সূচক ৯.৪.১ এর জন্য ভিত্তি ডেটা তৈরি করা, যা মূলত প্রতি ইউনিট যুক্ত মূল্যের CO_2 নির্গমন পরিমাপ করে;

২) ভবিষ্যতের জন্য ২০২৫ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই সূচকের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা;

৩) SDG ডেটা ট্র্যাকারকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি করা;

৪) জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক মেটাডেটা এবং স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ সমস্ত প্রমাণযোগ্য এবং সাম্প্রতিক ডেটার উপর ভিত্তি করে এই গবেষণাটি তৈরি করা;

পটভূমি:

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশগত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং যানবাহনের প্রভাবে বায়ু ও নদী দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি এবং গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) নিঃসরণের মতো সমস্যা পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের মারাত্মক অবনতি ঘটিয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সক্ষমতা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ২০১২ সালে রিও ডি জেনেইরোতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদান করেছে। এসডিজির ৯ নং লক্ষ্য "সহনশীল অবকাঠামো গঠন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা"-এর অধীনে টার্গেট ৯.৪-এ ২০৩০ সালের মধ্যে শিল্প ও অবকাঠামোকে টেকসইভাবে আধুনিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য সূচক ৯.৪.১-এ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল্য সংযোজনের অনুপাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) নিঃসরণ পরিমাপ করা হয়। এই সূচক বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। সূচকটি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কার্বন তীব্রতা মূল্যায়ন করা সম্ভব, যা টেকসই শিল্পনীতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়, যা পরিবেশবান্ধব নীতিমালা গ্রহণে

নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। এই প্রেক্ষাপটে, সূচক ৯.৪.১-এর জন্য বেসলাইন তথ্য ও পূর্বাভাস প্রস্তুতের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

গবেষণার ফলাফল:

১) ২০১৯ সালে, জ্বালানি পোড়ানো থেকে মোট CO_2 নির্গমনের পরিমাণ ছিল ১১৫.২৫৮ মিলিয়ন টন।

২) GDP (PPP) ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে CO_2 নির্গমনের পরিমাণ ছিল ০.৫৪ কেজি/মার্কিন ডলার (২০১৭)।

৩) ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যালু অ্যাডেড (MVA) এর প্রতি ইউনিটে CO_2 নির্গমনের পরিমাণ ছিল ০.৫০৭ কেজি/মার্কিন ডলার (২০১৫)।

৪) বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে এনার্জি সেক্টর সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গমণ করে, যা মোট নির্গমনের ৪০%। এরপরেই আছে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কন্সট্রাকশন সেক্টর, এই দুটি মিলিয়ে ২৩% কার্বন নির্গত হয়।

৫) অন্যান্য সেক্টর, যেমন পরিবহন এবং আবাসিক খাতও কার্বন নির্গমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬) ২০২৫ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে CO_2 নির্গমনের উল্লেখযোগ্য হ্রাস হতে পারে, যদি যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে, মোট নির্গমন ৮৫-৯০ মিলিয়ন টনে নেমে আসতে পারে। এছাড়াও, জিডিপি এবং MVA এর প্রতি ইউনিটে নির্গমন ২০-২৩% এবং ২১% হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

৭) সর্বোপরি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর অগ্রগতি পরিমাপের জন্য এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ডেটা ব্যবহার করা হবে। এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে সহায়ক হবে।

গ) Study of the SDG Indicator 14.2.1: Number of Countries using Ecosystems- based Approaches to Managing Marine Areas..

গবেষণার লক্ষ্য:

গবেষণার লক্ষ্য হলো হলো এসডিজি সূচক ১৪.২.১ (SDG Indicator 14.2.1) এর জন্য বেসলাইন ডেটা তৈরি করা এবং ২০২৫ ও ২০৩০ সালের জন্য অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১) ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সামুদ্রিক এলাকা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশগুলোর সংখ্যা;

২) জাতীয় এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ) গুলি ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপিত হওয়ার শতাংশ;

৩) এছাড়াও এই গবেষণার লক্ষ্য হলো নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করা, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার জন্য তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

পটভূমি:

বাংলাদেশের বিশাল উপকূলরেখা ও সমুদ্রসীমা দেশটির অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ১৪-এর আওতায় সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (EBM) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশটি তার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ)-এর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চেষ্টা করছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির মতো চ্যালেঞ্জগুলো সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও স্থানীয় জনগণের জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সামুদ্রিক সংরক্ষণ, ব্লু ইকোনমি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, সরকারি নীতি বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গবেষণা ও প্রযুক্তির ব্যবহার সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় সকল স্তরের জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে হবে।

গবেষণার ফলাফল:

১) মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া (MPAs): বাংলাদেশ তার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের (EEZ) ৮.৮% এলাকাকে সুরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২) ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (ICZM): উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

৩) ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হিলশা মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকা উন্নত করেছে।

৪) স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন এই দ্বীপের জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে অগ্রগতি হয়েছে।

৫) তথ্যের অভাব, দুর্বল আইন প্রয়োগ, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গবেষণার প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৬) স্থানীয় জনগণ এবং এনজিওদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৭) এই গবেষণা বাংলাদেশের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়তা করে ।

ঘ) Study of the SDG Indicator 14.1.1(a): Index of Coastal Eutrophication:

গবেষণার লক্ষ্য:

এই প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) সূচক 14.1.1(a), যা "উপকূলীয় ইউট্রোফিকেশন সূচক (ICEP)" নিয়ে কাজ করে, তার জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ এবং ২০২৫ ও ২০৩০ সালের জন্য অর্জনযোগ্য মাইলফলক নির্ধারণ করা। এর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১) উপকূলীয় ইউট্রোফিকেশনের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ;

২) ২০২৫ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে উপকূলীয় পুষ্টি দূষণ হ্রাস করার জন্য অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ;

৩) উপকূলীয় পুষ্টি দূষণ এবং এর পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ করে নীতিনির্ধারণের জন্য সহায়তা প্রদান;

৪) SDG সূচক 14.1.1(a) এর জন্য বৈশ্বিক রিপোর্টিং এবং অগ্রগতির ট্র্যাকিংয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা;

পটভূমি:

বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাপক দূষণের কারণে মারাত্মক ক্ষতির শিকার। বিশেষ করে পুষ্টি দূষণের ফলে উপকূলীয় ইউট্রোফিকেশন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মৎস্য, পর্যটন এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়ের উপর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) ২০১২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত হয়। এর মধ্যে SDG 14, বিশেষত টার্গেট 14.1, সামুদ্রিক দূষণ বিশেষ করে ভূমি-ভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট পুষ্টি দূষণ এবং বর্জ্য হ্রাসের উপর গুরুত্ব দেয়। সূচকটি " উপকূলীয় ইউট্রোফিকেশন সূচক (ICEP)" এর মাধ্যমে পুষ্টি দূষণ নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মূল পরিমাপক। এটি সমুদ্র এবং উপকূলীয় পরিবেশের স্বাস্থ্য এবং টেকসইতার উপর মনোযোগ দেয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী ব্যবস্থা থেকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি এবং স্থগিত পদার্থ প্রবাহিত হয়, যা উপকূলীয় এলাকাকে ইউট্রোফিকেশন এবং ক্ষতিকারক শৈবাল বৃদ্ধির ঝুঁকিতে ফেলে। এ সমস্যাগুলি মোকাবিলায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর অধীনে নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং নীতি উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, SDG সূচক 14.1.1(a) বাংলাদেশের উপকূলীয় দূষণ হ্রাস এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। এটি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অগ্রগতিকে মাপার পাশাপাশি কার্যকর কৌশল বিকাশে সহায়তা করে। সার্বিক দিক বিবেচনায় এই গবেষণাটি বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয়েছে উপকূলীয় জলে পুষ্টি দূষণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা এবং বাস্তুতন্ত্র ও জীবিকার উপর এর প্রভাব কমানোর জন্য। এটি এসডিজি ১৪-এর প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং উপকূলীয় ইউট্রোফিকেশন সূচক (ICEP) এর জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার ফলাফল:

১) জাতীয় পর্যায়ে মোট নাইট্রোজেন, ফসফরাস বা দ্রবীভূত সিলিকার কোনো ডেটা পাওয়া যায়নি।

২) পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ওশোনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিওআরআই), বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (বিসিজি), মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (এমওএসটি) সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো এখনও সূচক ১৪.১.১ক-এর বেঞ্চমার্ক অবস্থা নির্ধারণের জন্য কোনো ডেটা সংগ্রহ করেনি।

৩) স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ক্লোরোফিল-এ ডেটা নদীর নির্গমন অঞ্চলে ইউট্রোফিকেশনের বিভিন্ন ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।

৪) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী ব্যবস্থা পুষ্টি লোডের প্রধান উৎস, যেখানে কৃষি থেকে আসা বর্জ্য এবং অপরিশোধিত পয়:নিষ্কাশন প্রধান দূষণকারী;

৫) ডেটা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় কাঠামোর অভাব ব্যাপক ICEP মডেলিংকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

SDG 14.1.1(a) এর লক্ষ্য পূরণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে-

১) বঙ্গোপসাগরে প্রধান নির্গমন পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করা এবং বর্তমান প্রবাহের পরিমাণ মূল্যায়ন করা।

২) এই পয়েন্টগুলোতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং সিলিকার মাসিক ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করা।

৩) Remote sensing এবং ইন-সিটু ডেটা ব্যবহার করে একটি জাতীয় ICEP (International Coastal and Estuarine Partnership) মডেল তৈরি করা।

৪) সমগ্র বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal - BoB) উপকূল জুড়ে একটি ক্লোরোফিল-এ (Chlorophyll-a) পর্যবেক্ষণ।

৫) নিয়মিত প্রতিবেদন এবং অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা সমর্থন করার জন্য একটি জাতীয় উপকূলীয় পানির গুণমান ডেটাবেস স্থাপন করা।

৬) পরিশেষে, গবেষণায় বলা হয়েছে, যে বাংলাদেশ SDG 14 এর প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করলেও, ডেটার অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাবে ইউট্রোফিকেশন কার্যকরভাবে ট্র্যাক করার ক্ষমতা সীমিত। কার্যকর পদক্ষেপ তৈরি এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য পর্যবেক্ষণ পরিকাঠামো জোরদার করা, আন্তঃ-সংস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তৈরি করা অপরিহার্য।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর গবেষণা খাতে ১৮ (আঠার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ (একটি) গবেষণামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি IUCN (International Union for Conversion of Nature) কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণামূলক কার্যক্রমটির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

নং	গবেষণার শিরোনাম:	প্রতিষ্ঠান	বাজেট	সংশ্লিষ্ট শাখা	মন্তব্য
ক)	Inclusion of all the Ecological Critical Areas (ECAs) as Protected Areas (PA) in the World Database on Protected Areas (WDPA) and Identify & Include Key Biodiversity Areas (KBAs) in the World Database of KBAs (WDKBAS)	IUCN (International Union for Conversion of Nature)	১৮ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা শাখা	গবেষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য:

গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের ১৩টি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ECA) কে ওয়ার্ল্ড ডাটাবেজ অন প্রোটেক্টেড এরিয়া (WDPA) তে সংযুক্ত করার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা এবং বিদ্যমান কী বায়োডাইভার্সিটি এরিয়া (KBAs) পুনর্মূল্যায়ন করা। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং বাংলাদেশ বায়োডাইভার্সিটি আইন ২০১৭ এর আলোকে KBAs গুলির গুরুত্ব পুনর্বিবেচনা করা হবে। এছাড়াও, নতুন KBAs চিহ্নিত করে সেগুলিকে ওয়ার্ল্ড ডাটাবেজ অব KBAs (WDKBA) তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। গবেষণার আরেকটি লক্ষ্য হলো পরিবেশ অধিদপ্তরের এর কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, যেখানে ECAs এবং KBAs কে বিশ্ব ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই গবেষণা বাংলাদেশের SDG লক্ষ্য ১৪, ১৫ এবং কুনমিং- মন্ট্রিল গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্কের ৩০x৩০ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

গবেষণার ফলাফল:

গবেষণাটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ২০/০৫/২০২৫ তারিখে IUCN কর্তৃক এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।